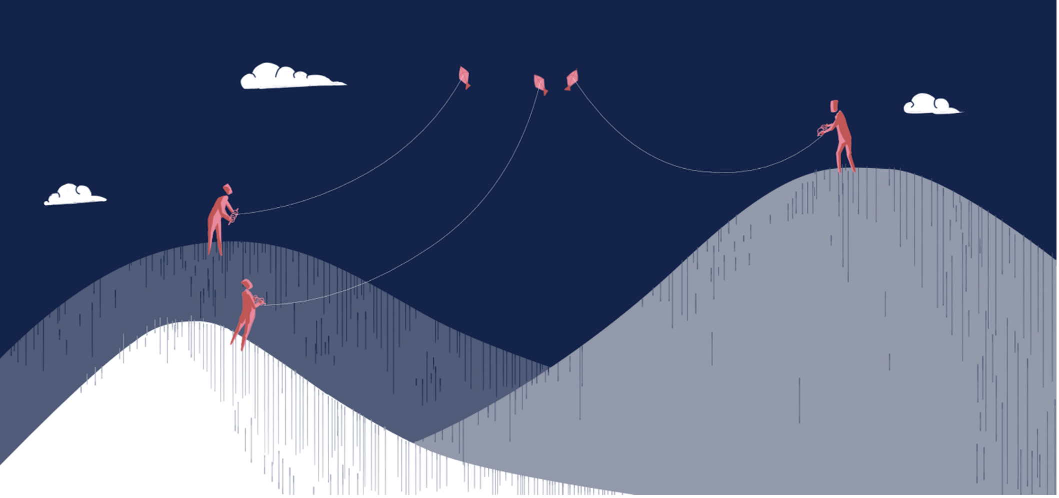


# সমতার ইশতেহার

# সূচীপত্র

# শুরুর কথা

'সমতার ইস্তাহার'–এর পরিকল্পনা প্রথমে মাথায় আসেনি। এর ভাবনাটা আসে আরেকটি ভাবনার সূত্র ধরে, মাঝপথে। সেই ভাবনাটা হল — ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিপুল বিজয়ের কারণ কী? সেই কারণ পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা গেল, বেশিরভাগ কারণই সামাজিক টানাপোড়েনের মধ্যের ব্যাপার নয়। তার পরিধির ব্যাপার। সাধারণ নির্বাচনে সামাজিক টানাপোড়েনের মুখ্য ভূমিকা সাধারণতঃ থাকে না। এবারেও নেই। এক ঝলকে দেখে নেওয়া যেতে পারে, কী কী সেই পরিধির কারণগুলি —

— প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক ও সাম্প্রতি দুর্বলতার কারণে প্রতিনিধির বদলে মানুষের শাসক নির্বাচনের প্রবণতা (পার্টির কমিটি ও নেতা নির্বাচন থেকে শুরু করে কলেজ, পুরসভা, পঞ্চায়েত নির্বাচন হয় বন্ধ হয়ে যাওয়া বা প্রহসনে পরিণত হয়ে যাওয়া — এগুলি সাম্প্রতিক দুর্বলতা),

— টাকা (এবারে যেমন সমস্ত পার্টি মোট যা খরচ করেছে, তার প্রায় সমান খরচ করেছে বিজেপি একাই),

— প্রচার (প্রায় সমস্ত মিডিয়া বিজেপির হয়ে প্রচার করেছে, সেই পুলওয়ামা এবং বালাকোটের সময় থেকে),

— নানা পার্টির মধ্যে নানা সমীকরণ (বহু পার্টি তলায় তলায় বিজেপিকে সমর্থন করেছে),

— জেতার সম্ভবনা (প্রাক নির্বাচনী সমীক্ষা),

— সরকার ও এজেন্সি,

— নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাত,

— শাসক দলের প্রতি স্বাভাবিক ক্ষোভ ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইসমস্ত ‘বড় বড়’ বা পরিধির কারণ নিয়ে আমাদের কিছু করার নেই। এগুলো আমাদের হাতে নেই। কিন্তু একটা মানুষের একটা ভোটের মধ্যে নিরঙ্কুশ সিংহভাগ যদি এই কারণগুলি হয়, তাহলেও বাকিটা তার সামাজিক টানাপোড়েনের গঠন। যে সামাজিক টানাপোড়েনের মধ্যে সে থাকে তা তার ওই গঠনকে নির্মাণ করে। আবার ভোট মিটে গেলে ওপরের ওই পরিধির কারণগুলি — যা কি না একেবারে ভোটকেন্দ্রিক, তা মিলিয়ে যায়, কিন্তু এই সামাজিক টানাপোড়েনের গঠনের অংশটুকু রয়ে যায় যা মানুষটি বহন করে জোয়ালের মতো। মানুষ করে। মানুষরা করে। প্রতিষ্ঠানগুলি করে। মিডিয়া করে। ব্যবসাপাতি বাণিজ্যরা করে। সরকার করে। উদ্যোগগুলি করে। আন্দোলনগুলি করে। সক্রিয়তাগুলি করে।

এই সামাজিক টানাপোড়েন সঞ্জাত কারণগুলি নিয়ে থাকবে প্রথম তিনটি পরিচ্ছদ। তারপরের পরিচ্ছদে থাকবে ‘সমতার ইস্তাহার’। তারপরের পরিচ্ছদে থাকবে সমতার ইস্তাহারের ওপর কয়েকটি প্রশ্নোত্তর, যা একইসাথে ইস্তাহারটিকে বুঝতে সহায়তা করবে এবং তার যাথার্থ নিয়ে কিছু প্রশ্নও জারি রাখবে।

সমতার ইস্তাহারের একটি মাসিক বসা এবং একটি ফেসবুক পেজ আছে। একটি চ্যাট গ্রুপ-ও থাকছে। পাঠকদের কাছে আবেদন, আমাদের ফেসবুক পেজ ফলো করুন, ছড়িয়ে দিন আমাদের লেখালেখি। আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে মাসিক বসাটিতে আসুন।

এই প্যাম্ফলেট-টির প্রায় পুরোটাই ভাগে ভাগে, সিরিজ-এ বেড়িয়েছিল azadi.live ওয়েবসাইটে। যারা পড়েছিল, তাদের আলোচনা সমালোচনা মতামত ঋদ্ধ তো করেইছে, তার মধ্যে কাজরীদি আর অমিতদা কিছু সংশোধন করতে বলেছিল পড়ে। ধারাবাহিক আলোচনা হয়েছিল সম্বুদ্ধ-র সাথে, প্রচ্ছদটিও ওর করা। তাদের স্পেশ্যাল কৃতজ্ঞতা।

**গ্রন্থনা — শমীক সরকার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯**
M. 9674486426 (শমীক), 8420503422 (সম্বুদ্ধ), 8961602216 (শ্রীদীপ)

*বিশদ জানতে ইন্টারনেটে খোঁজ করুন আমাদের ফেসবুক পেজটি*

fb.me/equitymanifesto

# বিজেপির কারণ ১ : পুরুষের প্রতিক্রিয়া

বিজেপির নেপথ্যে কী তা খুঁজতে গিয়ে যা যা পেলাম, তার কয়েকটা উল্লেখযোগ্য দিক আছে। একটি কারণ, ওই শিরোনামে যা আছে, পুরুষের প্রতিক্রিয়া। আসুন দেখে নেওয়া যাক, কীভাবে জন্ম নিচ্ছে এই পুরুষের প্রতিক্রিয়া। তার নেপথ্যে কী আছে?

**উচ্চশিক্ষায় মেয়েদের হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়া**

বিশ্বায়নের সময় থেকেই আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষায় মেয়েদের দ্রুত অন্তর্ভুক্তি শুরু হতে থাকে। সাধারণতন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার সময়, ১৯৫০–৫১ সালে যখন কলেজে প্রতি ১০০ জন কলেজছাত্রছাত্রীর মধ্যে সাকুল্যে ১১ জন ছিল মেয়ে, বাকি ৮৯ জন ছেলে; সেই অবস্থাটি বদলাতে বদলাতে, মানে মেয়েদের কলেজছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মেয়েদের অংশীদারী বাড়তে বাড়তে ১৯৯০–৯১ তে এটা পৌঁছয় ৩১ শতাংশে। অর্থাৎ কলেজছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৬৯ জন ছেলে আর ৩১ জন মেয়ে। দশক পিছু বৃদ্ধির হার ছিল গড়ে ৫ শতাংশ–বিন্দুর মতো। সেই অংশীদারী এই ২০১৭–১৮ তে পৌঁছেছে প্রায় ৪৮ এ। অর্থাৎ এখন কলেজছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৫২ জন ছেলে ৪৮ জন মেয়ে। গত প্রায় তিন দশকে সেটার দশক পিছু বৃদ্ধির গড় হার ছিল ৬ শতাংশ–বিন্দুর বেশি। ২০০০–২০০১ থেকে ২০১০–২০১১ এই দশকে বৃদ্ধির দশক পিছু হার সাত শতাংশ–বিন্দুর বেশি (সারণী ১)। যদিও যুবক যুবতীদের মধ্যে কলেজ ভর্তির হার এখনও যথেষ্ট কম, ২০১৭–১৮ সালে ১৮–২৩ বছর বয়সীদের মধ্যে এখনও মাত্র উচ্চশিক্ষার কোনো না কোনো ক্ষেত্রে ভর্তির হার (GER) ছিল ২৫.৮ শতাংশ। তবে এই হার প্রতি বছরই বাড়ছে, ২০০৩–

| সারণী ১ উচ্চশিক্ষায় মেয়েদের অংশীদারী | | |
|---|---|---|
| সাল | ছাত্রী শতাংশ | দশক পিছু শতাংশ–বিন্দু বৃদ্ধি |
| ১৯৫০–৫১ | ১১.৫% | |
| ১৯৬০–৬১ | ১৭.৪% | ৫.৮ |
| ১৯৭০–৭১ | ২১.৯% | ৪.৫ |
| ১৯৮০–৮১ | ২৬.৫% | ৪.৬ |
| ১৯৯০–৯১ | ৩১.৫% | ৫ |
| ২০০০–০১ | ৩৬.৭% | ৫.২ |
| ২০১০–১১ | ৪৩.৮% | ৭.১ |
| ২০১৭–১৮ | ৪৭.৬% | |
| ২০২০–২১ | ৪৯.৩% সাম্ভাব্য | ৫.৫ |

*সূত্র : কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের উচ্চশিক্ষা সমীক্ষার রিপোর্ট। www.aishe.nic.in*

৪ এ (GER) ছিল এখনকার অর্ধেক, মাত্র ১৩.২২ শতাংশ। এবং এখনও যুবকদের মধ্যে উচ্চশিক্ষায় অন্তর্ভুক্তির হার (২৬.৩ শতাংশ) যুবতীদের মধ্যে উচ্চশিক্ষায় অন্তর্ভুক্তির হার (২৫.৪ শতাংশ) এর তুলনায় এখনও কিছুটা বেশি, কিন্তু যদি অতীত দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে, এমনকি ২০১০–১১ সালেও যুবক ও যুবতীদের মধ্যে উচ্চশিক্ষায় অন্তর্ভুক্তির হারের তফাত ছিল প্রায় ৩ শতাংশ–বিন্দু (যথাক্রমে ২০.৮ এবং ১৭.৯), তা এই ২০১৭–১৮ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ১ শতাংশ–বিন্দু–রও কম–এ (সারণী ২)। এ থেকেই বোঝা যায়, বিশ্বায়নের সময়সাময়িক দুই দশক (৮০ ও ৯০ এর দশক) এবং তার পরবর্তী গত দুই দশক ধরে মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় অভূতপূর্ব অনুপ্রবেশ ঘটেছে। উল্লেখ্য, উচ্চশিক্ষায় অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে গত প্রায় এক দশকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষকশিক্ষিকার মধ্যে মেয়েদের হার এবং শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে মেয়েদের হারও উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। ২০১০–১১ সালে শিক্ষক ও শিক্ষিকার অনুপাত ছিল ৬৩ : ৩৭। আর ২০১৭–১৮ সালে সেটা দাঁড়িয়েছে ৫৮ : ৪২। ২০১০–১১ সালে প্রতি ১০০ জন পুরুষ অশিক্ষক শিক্ষাকর্মী পিছু মহিলা কর্মী ছিল ৩০ জন। ২০১৭–১৮ তে সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রতি ১০০ পুরুষ কর্মী পিছু ৪৭ জন মহিলা কর্মী। উচ্চশিক্ষা বা কলেজশিক্ষা শুধু শিক্ষাগত উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য উল্লেখযোগ্য, তা নয়। তা বরং অন্য নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। স্কুল পেরিয়ে কলেজে ঢুকলে আর ইউনিফর্ম পড়তে হয় না সাধারণতঃ। কলেজে ঢুকলে যেটা মেলে, তা হল

| সারণী ২ | ১৮–২৩ বছর বয়সে উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের হার | | |
|---|---|---|---|
| সাল | GER (ছেলে) | GER (মেয়ে) | ফারাক |
| ২০১০–১১ | ২০.৮% | ১৭.৯% | ২.৯%. |
| ২০১১–১২ | ২২.১% | ১৯.৪% | ২.৭%. |
| ২০১২–১৩ | ২২.৭% | ২০.১% | ২.৬%. |
| ২০১৩–১৪ | ২৩.৯% | ২২% | ১.৯%. |
| ২০১৫–১৬ | ২৫.৪% | ২৩.৫% | ১.৯%. |
| ২০১৬–১৭ | ২৬% | ২৪.৫% | ১.৫%. |
| ২০১৭–১৮ | ২৬.৩% | ২৫.৪% | ০.৯%. |

*GER হল গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও (১৮–২৩ বছর বয়সীদের* মধ্যে কতজন উচ্চশিক্ষার কোনো না কোনো ক্ষেত্রে – কলেজ, ইউনিভার্সিটি, ইনস্টিটিউট ইত্যাদিতে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, অথবা পিএইচডি–তে ভর্তি হয়েছে) সূত্র : *www.aishe.nic.in*

স্বাধীনতা। নিজের মতামত। আত্মবিশ্বাস। তাই উচ্চশিক্ষার শিক্ষার চেয়ে অনেক বড় সামাজিক ভূমিকা রয়েছে আমাদের দেশে। নিজের বাসনার কিছুটা হলেও মেটে কলেজে গেলে। এই কলেজ জনতার মধ্যে মেয়েদের অনুপাত ছেলেদের তুলনায় সামান্য থেকে সমান সমান হয়ে যাওয়ারও তাই সামাজিক প্রভাব আছে। যে শিক্ষা–স্বাধীনতার একমাত্র হকদার ছিল ছেলেরা, শিক্ষিত মানুষ বলতে মনের মধ্যে ছুপিয়ে থাকত পুরুষের মুখ, সেই ঐতিহ্যে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছে মেয়েরা। ছেলেদের বেশি জানা বেশি বোঝা এবং বেশি এক্সপোজারের গুমর আর থাকছে না। মেয়েরাও আর ছেলেদের আদরের জানু থাকছে না, যেখানে মেয়েরা 'নেবে' আর ছেলেরা 'দেবে'। মেয়েরা কুঁইকুঁই করবে, ছেলেরা তাদের রক্ষা করবে। ছেলেরা মেয়েদের থেকে যে নিঃশর্ত ভালোবাসা এবং নির্ভরতা প্রত্যাশা করত, তার যে অনেকটাই মেয়েদের পূর্বেকার অসহায়তা প্রসূত, তা হাড়ে হাড়ে বুঝছে। শিক্ষিত ছেলেদের সমাজে এক্সট্রা হাবভাবে চোনা লাগছে। এসে গেছে শিক্ষিত মেয়ে। এবং তা সমানে সমানে প্রায়।

মেয়েদের উচ্চশিক্ষাজগতে এই হইহই করে ঢুকে পড়া শিক্ষিত তথা শিক্ষার কদর করা পুরুষ সমাজে একটা গোপন ত্রাসের সঞ্চার করেছে। সে পড়েছে সঙ্কটে, এতদিনকার গরিমা হারিয়ে। গঠন হয়েছে পুরুষ প্রতিক্রিয়া।

মেয়েদের এই উচ্চশিক্ষাজগতে হইহই করে ঢুকে পড়া কি শুধু মেয়েদের আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সম্ভব হয়েছে? না। শুধু সরকারি উদ্যমে সম্ভব হয়েছে? একেবারেই না। শুধু মিডিয়ার প্রভাবে হয়েছে? না। তবে এই

সবেরই ভূমিকা আছে। তবে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা আছে কার? অবশ্যই মেয়েদের। মেয়েরা সামাজিক বিষয়ী হিসেবে নিজেরা কলেজে ঢুকেছে। কেউ বলতে পারে, ছেলেদের দেখাদেখি গেছে। যেমন সাধারণতঃ ছেলেরা বলে থাকে 'আজকালকার' মেয়েদের কার্যকলাপ সম্পর্কে – মেয়েরা কেন ছেলেদের দেখাদেখি ছেলে সাজতে যাবে? সিগারেট খাবে? উত্তর হল, মেয়েরা যা প্রাণে চায় তা–ই করবে। এখানে মেয়েরা নিজেরা যা প্রাণে চায় তাই একটু একটু করে করতে পেরেছে এই কলেজে ঢুকে পড়ার মধ্যে দিয়ে। কারণ সে ছেলেদের দেখে বুঝে গেছিল, অন্ততঃ কলেজে ঢুকে পড়লে, আরো একটু বেশি যা প্রাণে চায় তা করতে পারবে।

**মেয়েদের চাকরি**

এ তো গেল উচ্চশিক্ষার কথা, যেখানে ঢুকে পড়া মেয়েদের বেশ খানিকটাই নিজের হাতে ছিল। এবার আসা যাক চাকরির কথায়। আপাতদৃষ্টিতে রোজগেরে মেয়ে যেন কমেছে গত কয়েক বছরে। অন্ততঃ এনএসএস–এর পর্যায়ক্রমিক সমীক্ষা সেই কথাই বলে। কিন্তু শুধু কি তাই? এনএসএস এর সমীক্ষা থেকেই পাওয়া যায় নিম্নলিখিত টেবিলটি (সারণী ৩)। স্বনিযুক্তি এবং চুক্তি রোজগারের চেয়ে তুলনায় নিরাপদ এবং নিয়মিত রোজগার বা চাকরিতে শিফট করেছে মেয়েরা। শহরের ক্ষেত্রে ১৯৮৭–৮ সালে কর্মরতা মেয়েদের যত শতাংশ চাকরি করত, ২০১৭–১৮ তে সেই শতাংশ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। এবং ভুললে চলবে না, এই সময়কালে শহরের জনসংখ্যাও বেড়েছে গ্রামের তুলনায়। স্বনিযুক্তি হল কৃষিকাজ সহ ঘরোয়া কাজ। সেই কাজে যুক্ত থাকা মেয়েদের (ঘরের পুরুষদের তুলনায়) স্বাধীন ও স্বাবলম্বনের মনোভঙ্গী তৈরি করে না। কারণ এগুলো ঘরের পুরুষদের ওপর নির্ভরশীল। না তাদের অর্থনৈতিকভাবে জোরালো পায়ে দাঁড় করায় যেখান থেকে তারা ঘরের পুরুষদের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারে। ক্যাজুয়াল কাজও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিতে অক্ষম। কেন ঘরের পুরুষদের তুলনায় স্বাধীন ও স্বাবলম্বনের মনোভঙ্গীর কথা বললাম? কারণ, মহিলাদের পুরুষের অধীনতা মূলতঃ ঘরে বা চেনা পুরুষদের কাছে। মহিলাদের চেনা মহল বা সমাজ হল পুরুষতান্ত্রিক, মানে যেটাকে স্বাভাবিক সমাজ বলে মনে হয়, সেটা গোটাটাই পুরুষটির কথা ভেবে পুরুষটির বানানো। তাই মেয়েদের স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বনের প্রাথমিক বাধা ঘরের পুরুষরা, চেনা পুরুষরা। তার কাছের সমাজ। সেখানে চোখে চোখ রেখে কথা বলার স্পর্ধা তৈরি হওয়া, সেখানে আপন বাসনার প্রকাশ, সেই চেনা সমাজ–কে নিজের (মেয়েদের)

| সারণী–৩ | রোজগেরে মহিলাদের কাজের ধরন, মূল ও আংশিক রোজগার মিলিয়ে | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | শহর | | | গ্রাম | | |
| সাল | চাকুরি | স্বনিযুক্তি | ক্যাজুয়াল | চাকুরি | স্বনিযুক্তি | ক্যাজুয়াল |
| ১৯৮৭–৮৮ | ২৭.৫% | ৪৭.১% | ২৫.৪% | ৩.৭% | ৬০.৮% | ৩৫.৫% |
| ১৯৯৩–৯৪ | ২৮.৪% | ৪৫.৮% | ২৫.৮ | ২.৭% | ৫৮.৬% | ৩৮.৭% |
| ১৯৯৯–২০০০ | ৩৩.৩%<br>পুং ৪১.৭% | ৪৫.৩% | ২১.৪% | ৩.১% | ৫৭.৩% | ৩৯.৬% |
| ২০০৪–০৫ | ৩৫.৬% | ৪৭.৭% | ১৬.৭% | ৩.৭% | ৬৩.৭% | ৩২.৬% |
| ২০০৯–১০ | ৩৯.৩% | ৪১.১% | ১৯.৬% | ৪.৪% | ৫৫.৭% | ৩৯.৯% |
| ২০১১–১২ | ৪২.৮% | ৪২.৮% | ১৪.৩% | ৫.৬% | ৫৯.৩% | ৩৫.১% |
| ২০১৭–১৮ | ৫২.১%<br>পুং ৪৫.৭% | ৩৪.৭% | ১৩.১% | ১০.৫% | ৫৭.৭% | ৩১.৮% |

*সূত্র: শর্মা ও সাহা, The NEHU Journal, Vol XIII, No. 2, Jul-Dec 2015, pp-17-30, এবং ১৯৯৯–২০০০ ও ২০১৭–১৮ এনএসএস রিপোর্ট*

সুবিধা অসুবিধা বিচার করে পুনর্গঠন করা – এটাই পুরুষতন্ত্র বলা হোক বা পিতৃতন্ত্র বলা হোক, তার বিরুদ্ধে আঘাত এবং ঠিক এই জায়গাতেই ছেলেদের সাথে মেয়েদের সংঘর্ষের জায়গা। ঠিক এই জায়গাতেই মেয়েদের সক্ষমতা ছেলেদের বিচলিত করে। নিচের টেবিলটা (সারণী ৩) ভালো করে খেয়াল করুন। ১৯৯৯–২০০০ সালে শহরে রোজগেরে পুরুষদের মধ্যে ৪১.৭ শতাংশ ছিল চাকরিরত (ব্র্যাকেটের মধ্যে সংখ্যাটা দেওয়া আছে)। তখন শহরে রোজগেরে মহিলাদের মধ্যে ৩৩.৩ শতাংশ ছিল চাকরিরত। আর ২০১৭–১৮ সালে শহরে রোজগেরে পুরুষদের মধ্যে ৪৫.৭ শতাংশ চাকরিরত, কিন্তু রোজগেরে মহিলাদের মধ্যে শতাংশের মাত্রাটা বেড়ে হয়েছে ৫২.১ শতাংশ, অর্থাৎ পুরুষের শতাংশকে ছাপিয়ে গেছে, এবং শহরের মোট রোজগেরে মহিলাদের বেশিরভাগই এখন চাকরিরত। যদিও এখনো (২০১৭–১৮) শহরে রোজগেরে পুরুষের (মোট শহরবাসী পুরুষের ৫৭ শতাংশ) তুলনায় রোজগেরে মহিলা (মোট শহরবাসী মহিলার ১৫.৯ শতাংশ) অনেক কম, তিন ভাগের এক ভাগও নয় (এবং এই অনুপাত ও শতাংশগুলি বিশ্বায়নের প্রথম দশকেও প্রায় একইরকম ছিল (১৯৯৩–৯৪ – পুং ৫৪ ম ১৬.৫; ১৯৯৯–২০০০ — পুং ৫৪ ম ১৪.৭)), তবু এটা স্পষ্ট যে স্বনিযুক্ত বা ক্যাজুয়াল রোজগারের মাধ্যমে পুরুষের সংসারে ফুটিফাটা ঢাকা দেওয়ার কাজের বদলে শহরের মেয়েরা স্বাবলম্বনের জন্য স্বাধীনতার জন্য চাকরি করতে চাইছে এবং এই প্রবণতা একটি ক্ষুদ্র হলেও বাসনায় খুব শক্তিশালী একটি মেয়ে সমাজ তৈরি করে দিচ্ছে, যা ছেলেদের অস্বস্তির কারণ হচ্ছে।

বিশ্বায়নের সময় থেকে ধীরে ধীরে গতি বাড়িয়ে উচ্চশিক্ষায় ছেলেদের সঙ্গে প্রায় একাসনে এসে যাওয়া এবং চাকরিক্ষেত্রে ভাগ বসানো – এই দুইয়ের মাধ্যমে মেয়েদের, বিশেষতঃ শহরবাসী মেয়েদের খুব ছোট্ট হলেও নিজের মতো করে, আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক কিন্তু তলিয়ে দেখলেই পিতৃতান্ত্রিক তথা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পুনর্গঠনের সক্ষমতা হাজির হওয়া পুরুষের নজর এড়ায়নি। অস্বস্তি বেড়েছে।

এখানে ফের বলা যাক – এই যে চাকরির দুনিয়া, যা কিনা ছিল মূলতঃ পুরুষদের মুক্তাঞ্চল, সেখানে মেয়েদের ভাগ বসানো – এ কি শুধু মেয়েদের আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সম্ভব হয়েছে? না। শুধু সরকারি উদ্যমে (সংরক্ষণ ইত্যাদি) সম্ভব হয়েছে? একেবারেই না। শুধু মিডিয়ার প্রভাবে হয়েছে? না। তবে এই সবেরই ভূমিকা আছে। তবে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা আছে কার? অবশ্যই মেয়েদের। সামাজিক বিষয়ী হিসেবে মেয়েরা চাকরিক্ষেত্রে ভাগ বসাচ্ছে, বসাতে চেয়েছে। এখনও নিঃসন্দেহে অনেকটা পথচলা বাকি আছে, কিন্তু গতি নির্ধারকভাবে ঊর্ধমুখী।

কিন্তু তাহলে ছেলেদের প্রতিক্রিয়া সরাসরি মেয়েদের বিরোধী হচ্ছে না কেন ? হচ্ছে তো। এত বেশি ধর্ষন শ্লীলতাহানির খবর কিসের ইঙ্গিত ? যে সমস্ত মতামত (নারীবাদ, উদারবাদ ইত্যাদি) মেয়েদের এই সামাজিক বিষয়ী হবার বাসনায় মদত দিচ্ছে, সেগুলির প্রতি পুরুষের ঘৃণা কীসের ইঙ্গিত ? পুরুষদের যে এই 'আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম' সুলভ হাকান্দেপনা, তা কীসের ইঙ্গিত ? ফেলে আসা সময়ের পিতৃতান্ত্রিক / পুরুষতান্ত্রিক সমাজ–পরিবার–পাড়ার আশ্লেষ নয় তো কী? তবে হ্যাঁ, রাজনৈতিকভাবে এই পুরুষ–প্রতিক্রিয়া কখনোই মেয়েবিরোধী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে না এখনো। মেয়েদের বিরুদ্ধে ছেলেদের সংগঠন তৈরি হয়েছে ইতিউতি, কিন্তু তার বড়োসড়ো রাজনৈতিক প্রকাশ নেই। ঠিক এইখানেই লুকিয়ে আছে, আধিপত্যকারী সামাজিক শক্তির প্রতিক্রিয়া কীভাবে চলতি রাজনীতির একটি ছকে নিজেকে প্রকাশ করে, তার চমৎকার উদাহরণ। প্রতিক্রিয়া যথাযথভাবে ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রকাশ ঘটাবে, তা কিন্তু নয়। প্রকাশ কী? প্রকাশ কাকে বলে? প্রকাশ মানেই হল ঠিক যেটা প্রকাশ হতে চাইছে সেটা প্রকাশিত হওয়া নয়, বস্তুত যেটা প্রকাশিত হতে চাইছে সেটা কখনোই প্রকাশিত হতে পারে না। প্রকাশ পায় প্রকাশযোগ্য রূপে। সেই প্রকাশযোগ্য রূপটি কী? সেই প্রকাশযোগ্য রূপটিই হল বিজেপি। সেই প্রকাশযোগ্য রূপটিই হল সংঘ পরিবারের রাজনীতির রূপ, যা কখনোই সাধারণভাবে মেইনস্ট্রিম হয়ে উঠতে পারেনি, যদিও প্রায় ১০০ বছর হয়ে গেল তা বেশ



চিত্র ১ : বাঁদিকে, কাল্পনিক গেরুয়া হনুমান। মাঝে, রূপকথার হনুমানের নিজের ল্যাজের আগুন দিয়ে (বি)দেশ জ্বালানো। ডানে, ল্যাজে আগুনের তাপ উপলব্ধিতে এলে তড়িঘড়ি ফুঁ দিয়ে আগুন নেভাতে গিয়ে মুখ পুড়িয়ে ফেলার পর অনুশোচনা দগ্ধ রক্তমাংসের ভারতীয় ল্যাঙুর হনুমান। তিনটে ছবি গুগল সার্চ থেকে পাওয়া – আমি জোড়া লাগিয়েছি পাশাপাশি।

ভালোমতোই রয়েছে ভারতের সমাজে। সেই প্রকাশযোগ্য রূপটিই হল গেরুয়া হনুমানের মতো কাল্পনিক একটি প্রাণী, যা হুপহাপ করে নিজের ল্যাজের আগুন দিয়ে নানা স্থানে আগুন লাগিয়ে বেড়ায়। ততক্ষণ তা আগুন লাগিয়ে বেড়াবে, যতক্ষণ না নিজের ল্যাজের আগুনের আঁচ লাগবে নিজের, তখন সেই আগুন নেভাতে গিয়ে নিজের গেরুয়া মুখ পুড়িয়ে ফেলে পোড়ামুখো রক্তমাংসের বাস্তব হনুমান হয়ে উঠবে এই পুরুষ প্রতিক্রিয়া (চিত্র ১)।

আজ যদি সমস্ত আন্দোলন, সমস্ত ছোট্ট ছোট্ট সক্রিয়তা, শৈল্পিক প্রকাশ, চিন্তা, ভাবনা, আচরণ, সম্ভাষণ, সামাজিকতা, সরকারিতা, ব্যবসা, মিডিয়া – সমস্ত কিছুতে যদি এই মেয়েদের স্বাধীনতা, স্বাবলম্বন ও স্বরক্ষার বাসনাকে, সমাজটাকে মেয়েদের নিজেদের মতো করে বদলে নেবার বাসনাকে, মেয়েদের সক্ষমতার এই অঙ্কুরকে জায়গা দিতে না পারে, অংশীভূত করতে না পারে অর্থাৎ নিজের গঠনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে তাকে জায়গা দিতে না পারে – তাহলে তা দেখতে যতই যা কিছু হোক – এই পুরুষ প্রতিক্রিয়ার অঙ্গীভূত হবার নিয়তি থেকে তার রেহাই পাওয়া মুশকিল।

# বিজেপির কারণ ২ : হিন্দুর উদ্বেগ

বিজেপির নেপথ্যে কী তা খুঁজতে গিয়ে পেলাম হিন্দুর উদ্বেগ। যা ভোটের আগেও ছিল। ভোটের পরেও রয়েছে।

## **হিন্দুর উদ্বেগ ও হিন্দু শাসক–এর আকুতি**

সিএসডিএস–এর ভোট পরবর্তী ভোটার–সাক্ষাৎকার প্রসূত সমীক্ষা থেকে বেরিয়ে এসেছে, বিজেপির ভোট শেয়ার হিন্দুদের সমস্ত জাত–বিভাজনের মধ্যে বেড়েছে। ২০১১ সালের জাত–জনগণনার হিসেব অনুযায়ী, অগ্রবর্তী বা উঁচু জাতের মানুষ জনসংখ্যার ৩০ শতাংশের একটু বেশি। ওবিসি বা পশ্চাদবর্তী মানুষ জনসংখ্যার ৪১ শতাংশ। তপশিলি জাতির মানুষ জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ। আর তপশিলি উপজাতির মানুষ জনসংখ্যার ৯ শতাংশের মতো। ওবিসি–দের মধ্যে আছে মুসলিমদের চল্লিশ শতাংশ, আর অসংরক্ষিতদের মধ্যে বাকি ষাট শতাংশ। সবমিলিয়ে ১৪ শতাংশের একটু বেশি। সিএসডিএস–এর সমীক্ষায় এই উঁচু জাতগুলির মধ্যে দুটি ভাগ করা হয়েছে। সর্বোচ্চ উঁচু জাত (মূলতঃ ব্রাহ্মণ) এবং উঁচু কৃষক–জাত। সিএসডিএস দেখাচ্ছে, উঁচু জাতগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ যে জাতগুলি, সেগুলিতে গত ২০১৪ নির্বাচনের তুলনায় অনেক সমর্থন বেড়েছে বিজেপির। ২০১৯ এ ৬১ শতাংশে পৌঁছেছে। এর আগে একটি সমীক্ষায় সিএসডিএস দেখিয়েছিল, ওই সর্বোচ্চ উঁচু জাত–এর মধ্যে বিজেপির ক্যাডার অনেক বেশি। সে যাই হোক, এরপর উঁচু কৃষক–জাতগুলির মধ্যেও বেড়েছে সমর্থন। দলিত ও নিচু কৃষক জাতগুলির মধ্যেও বেড়েছে। তপশিলি উপজাতিদের মধ্যে আগেই প্রচুর সমর্থন ছিল, এবার আরো বেড়েছে। একমাত্র সমর্থন

বাড়েনি (বলা ভালো, একটু কমেছে) মুসলিমদের মধ্যে। ওই সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে। হিন্দু ভোটের প্রায় ৪৫ শতাংশ পেয়েছে একা বিজেপি, দাক্ষিণাত্যের দু–তিনটি রাজ্যে তেমন কোনো সমর্থন না পাওয়ার পরেও। দাক্ষিণাত্যের ওই কয়েকটি রাজ্য যদি বাদ দেওয়া যায়, তাহলে হয়ত দেখা যাবে, হিন্দু ভোটের অর্ধেকেরও বেশি পেয়েছে একা বিজেপি। ওই সমীক্ষাতে এটাও দেখা যাচ্ছে যে সমস্ত অর্থনৈতিক বর্গের মধ্যে বিজেপির সমর্থন বেড়েছে ২০১৪–র তুলনায়। আবার বলে দিচ্ছি, এই সমীক্ষাটি ভোট পরবর্তী সমীক্ষা।

কিন্তু বিজেপি তার পাঁচ বছরের শাসনকালে ধনী বাদে অন্য সমস্ত অর্থনৈতিক বর্গের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়েছে। নোটবন্দীর কারণে কাজ হারিয়েছে বিপুল সংখ্যক মানুষ, হ্যারাসমেন্ট হয়েছে কোটি কোটি মানুষের, লাভের লাভ কিছু হয়নি। কালো টাকার ব্যবহার কমেনি। পেটিএম ইত্যাদি ডিজিটাল আদানপ্রদানের পরিমাণ ওইসময় একটু বেড়েছিল, তারপর যে কে তাই। ব্যাঙ্কগুলি মানুষের ওপর অত্যাচার করেছে। জিএসটির মধ্যে দিয়ে ব্যবসায়ী, বিশেষতঃ ছোটো খুচরো ব্যবসায়ীদের সমস্যা হয়েছে। পেট্রোল ডিজেল গ্যাস সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। দলিতদের ওপর ছোটোখাটো নিপীড়নের ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রতিটি বর্গকে চটিয়ে দেবার পরও বিজেপির প্রতি সমর্থন বাড়ার কারণ কী? একটা কারণ তো এটা অবশ্যই, যে ভারতবাসী আসলে শাসক নির্বাচন করছে। সে অন্ততঃ লোকসভা নির্বাচনে আর প্রতিনিধি নির্বাচন করছে না। কখনোই কি করেছিল? যদি প্রতিনিধিই নির্বাচন করত, শাসক নির্বাচন না করে, তাহলে কি জরুরি অবস্থা জারির কয়েক বছরের মধ্যেই ইন্দিরা গান্ধী বিপুল ভোটে জয়ী হতে পারত? বলা যায়, লোকসভা ভোটে ভারতবাসীর শাসক নির্বাচনের ঐতিহ্য এতটুকু বদলায়নি।

## হিন্দুর পুরনো উদ্বেগ : মুসলিম জনবিস্ফোরণের ভয়, এখন অমূলক

এমনিতে আমাদের দেশে হিন্দুর নতুন করে উদ্বিগ্ন হবার কোনো কারণ নেই। নানা ধরনের হিন্দু মিলিয়ে মিশিয়ে ২০১১ সালের জনগণনায় পরিষ্কার দেখা যায়, আমাদের দেশের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। প্রায় ৮০ শতাংশ। অপরদিকে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের শতাংশ ১৪ শতাংশের একটু বেশি। মুসলিমদের মধ্যে সন্তানধারনের হার সামান্য বেশি হবার কারণে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের শতাংশ খুব সামান্য করে বেড়েছে প্রতি দশকেই (জনগণনার তথ্য, জনগণনা প্রতি দশকে হয়)। মুসলিমদের মধ্যে সন্তানধারনের হার এখন সামান্য বেশি –

| সারণী ১ | জনগণনার তথ্য–তে মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও বৃদ্ধির হার | |
|---|---|---|
| সাল | মুসলিম জনসংখ্যার শতাংশ | মুসলিম জনসংখ্যার শতাংশের দশক পিছু বৃদ্ধির হার (শতাংশ বিন্দু) |
| ১৯৬১ | ১০.৬৯% | ০.৮৯ |
| ১৯৭১ | ১১.২১% | ০.৫২* |
| ১৯৮১ | ১১.৭৫% | ০.৫৪* |
| ১৯৯১ | ১২.৬১% | ০.৮৬ |
| ২০০১ | ১৩.৪৩% | ০.৮২ |
| ২০১১ | ১৪.২৩% | ০.৮ |

** এই দুই দশকে ভারত–পাক যুদ্ধ ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ থেকে বহু হিন্দু অভিবাসন হয় ভারতে। ফলতঃ মুসলিম জনসংখ্যার শতাংশের দশক পিছু বৃদ্ধি কমে যায়। সূত্র : জনগণনার রিপোর্ট*

এই নিয়ে আমাদের দেশের হিন্দুদের উদ্বেগ কম নেই এমনিতেই। যদিও গত তিনটি দশকে জনগণনার রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, মুসলিম জনসংখ্যার শতাংশগত বৃদ্ধির হার কমছে, ০.৮৬ থেকে ০.৮ হয়েছে ( (সারণী –১)। অর্থাৎ যদি এই উদ্বেগে নতুন কোনও ইন্ধন যুক্ত হয়নি। ফলতঃ নব্য হিন্দু উদ্বেগে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি কারণ নয়।

সেক্ষেত্রে প্রশ্ন আসাই স্বাভাবিক, নতুন করে হিন্দু উদ্বেগের কারণ কী?

## পুলওয়ামা ও বালাকোট

আমার মনে হয়, জরুরি অবস্থা জারির ঠিক পরের নির্বাচনে গো–হারা হেরে যাবার পরেও, পাকিস্তানকে ভেঙে দু–টুকরো করে দেওয়া ভারতমাতার বেশ–এ জরুরি অবস্থা জারির ১০ বছরের মধ্যে ইন্দিরা গান্ধীর বিপুল ভোটে জিতে ফেরত আসার সঙ্গে এই নির্বাচনে মোদির জয়লাভ তুলনীয়। এবং সমাজে এই মনোভঙ্গী তৈরিতে সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকা নিয়েছে, পুলওয়ামা এবং বালাকোট।

হ্যাঁ, হিন্দু উদ্বেগ থেকে হিন্দু শাসক নির্বাচন — এটাই ছিল এইবারের নির্বাচনের মূল সুর। দেশের মধ্যে মুসলমানের কোনো শ্রীবৃদ্ধি নয়, বরং মুসলিম প্রধান প্রতিবেশী পাকিস্তানের ‘কাশ্মীর আগ্রাসন’–এর মুখে দাঁড়িয়ে দেশে হিন্দু শাসক নির্বাচন — এই ন্যারেটিভ বা বয়ান কাজ করেছে। গত পাঁচ বছরে বিজেপি সরকারের ভ্রান্ত কাশ্মীর নীতির কারনে কাশ্মীরে অস্থিরতা, জঙ্গীমৃত্যু, সেনামৃত্যু, বনধ্, শেষমেশ কাশ্মীরের নির্বাচিত সরকারটাই তুলে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি, কাশ্মীরের আজাদির স্লোগান ইন্টারনেটের

কল্যাণে কাশ্মীর উপত্যকা ছাড়িয়ে ভারতের শহরাঞ্চলগুলিতে পৌঁছে যাওয়া — এসবই ভেতরে ভেতরে, 'প্রতিবেশী মুসলিম প্রধান পাকিস্তানের তরফে ভারতের একটি মুসলিম প্রধান রাজ্য কাশ্মীর আগ্রাসন'–এর বয়ান তৈরি করছিল। উগ্র জাতীয়তাবাদী হিন্দি ও ইংরেজি মিডিয়া এবং সংঘ পরিবার তথা বিজেপির সুবিশাল প্রচার বাহিনী এই বয়ান তৈরিতে সহায়তাও করছিল। একইসাথে পূর্ব সীমান্তে বাংলাদেশও মুসলিম প্রধান প্রতিবেশী রাষ্ট্র। সেই প্রতিবেশী রাষ্ট্র পশ্চিমবঙ্গ তথা আসামের একটা অংশে আগ্রাসন চালাচ্ছে — এই মর্মেও প্রচার ছিল। এবং কাশ্মীরের নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতির মতো পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জিও যে এই আগ্রাসনের মুখে দাঁড়িয়ে দুর্বল হয়ে পড়ছে — এই বয়ানও সাজানো হচ্ছিল বেশ ভালোমতোই। কাশ্মীরের ব্যর্থতাকে সুচারুভাবে পাকিস্তানের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে পাঁচ বছর ধরে এই তৈরি হতে থাকা হিন্দু উদ্বেগ–এ ঘৃতাহুতি পড়ে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকের পুলওয়ামার নৃশংস সন্ত্রাসবাদী হামলায়। সিআরপিএফের চল্লিশের বেশি আধা–সেনা একটি গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে মারা যায়, এবং এই ঘটনাকে উগ্র–জাতীয়তাবাদী মিডিয়া ও সংঘ পরিবারের প্রচারবাহিনী এক সুরে 'পাকিস্তানের আগ্রাসন'–এর রূপ দেয়। এর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বালাকোট–এ বিমানবাহিনী দিয়ে হামলা চালিয়ে 'হিন্দু শাসক' এর বয়ানে শেষ লাইনটি লেখে বিজেপি। 'হিন্দু উদ্বেগ' প্রতিনিধি খোঁজার চেষ্টা থেকে একেবারে সরে গিয়ে নির্ধারকভাবে 'হিন্দু শাসক' –এর দ্বারস্থ হয়, সে প্রায় রাজশাসনের আকাঙ্খার মতো। রাজশাসনের সার্বভৌমত্বের চাহিদা যেন ফিরে আসে। 'হিন্দু শাসক' বয়ানকে সংহত করতে বিজেপি স্লোগান তোলে, 'চৌকিদার', কংগ্রেস সহ বিরোধীরা পাল্টা হিসেবে 'চৌকিদার'কে সত্যি সত্যিই আক্ষরিক অর্থে দারোয়ান ভাবাতে গিয়ে 'চৌকিদার চোর হ্যায়' স্লোগানের মধ্যে দিয়ে বিজেপির 'চৌকিদার' এর অর্থ যে আসলে 'হিন্দু শাসক' — এই বয়ানকেই জোরদার করতে থাকে। পুলওয়ামা থেকে বালাকোট — এই পুরো পর্যায়ে ইমরান খানের নেতৃত্বে পাকিস্তানের যুদ্ধ–এড়িয়ে–যেতে–চাওয়া, নরম, সম্প্রীতিমূলক ও উদারবাদী মনোভাবে সুবিধা হয় এই 'হিন্দু শাসক' বয়ানের। 'হিন্দু উদ্বেগ' খানিক স্বস্তি পায়, পাকিস্তান ভয় পেয়েছে। 'হিন্দু শাসক' মোদির ওপর আস্থা আসে।

প্রশ্নটা হল, আমরা তো নির্বাচনের তুরীয় মুহূর্তে কী দাঁড়ালো, তার বদলে বিজেপি–র দীর্ঘস্থায়ী কারণ, অর্থাৎ নির্বাচনের পরেও যা বিজেপি–র নেপথ্যের নেপথ্য হিসেবে রয়ে গেল — তা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। এই 'হিন্দু উদ্বেগ' এবং 'হিন্দু শাসক'–এর আকুতি — এই দুটোই কি সামাজিক

| সারনী ২ ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার বাড়বৃদ্ধি | | | | |
|---|---|---|---|---|
| সাল | সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (IPC 147-151) | আক্রান্ত | মোট দাঙ্গা হাঙ্গামার কত ভাগ সাম্প্রদায়িক | ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক ঘটনা (IPC 153A) |
| ২০১৪ | ১২২৭ | ২০০১ | ১৮.৮% | ৩২৩ |
| ২০১৫ | ৭৮৯ | ১১৭৪ | ১৯.২% | ৩৭৮ |
| ২০১৬ | ৮৬৯ | ১১৩৯ | ২০% | ৪৪৭ |
| *সূত্র : ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো, কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়েবসাইট। এটাই সর্বশেষ রিপোর্ট* | | | | |

টানাপোড়েন প্রসূত দীর্ঘস্থায়ী কারণ ?

হ্যাঁ এবং না। ‘হিন্দু উদ্বেগ’ এবং ‘হিন্দু শাসক–এর আকুতি’ এই দুটিই ভারতবর্ষের সমাজের দুটি নেপথ্য প্রতিকৃতি বা ইমেজ। এই প্রতিকৃতি দুটি তৈরি হয়েছে দেশভাগের ইতিহাসের আয়নায়। যে দেশভাগের সলতে পাকানোর কাজ শুরু হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে ব্রিটিশদের করা ভারতবর্ষের জনগণনায় একটি বৃহত্তর ‘হিন্দু’ ধর্মীয় সত্ত্বা নির্মাণের মধ্যে দিয়ে, যার সীমানা চিত্রায়িত করা হয়েছিল ‘যারা মুসলিম নয়’ দিয়ে, ব্রিটিশ শাসকের মোটা বুদ্ধি বা দুরভিসন্ধির কারণে। এই প্রতিকৃতি তৈরি হয়েছে দেশভাগের ফলে তৈরি হওয়া পাকিস্তান ও পরে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ক্রমঃ ইসলামিকরণ–এর মিডিয়াবাহিত রূপের আয়নায়। এই প্রতিকৃতি তৈরি হয়েছে দুনিয়াজোড়া সন্ত্রাসবাদী হামলাগুলোর সঙ্গে ইসলাম ধর্মের সর্বাধিক সংশ্লিষ্ঠতার মিডিয়াবাহিত রূপের আয়নায়। এই প্রতিকৃতি তৈরি হয়েছে কাশ্মীরের অস্থিরতার ক্রমবর্ধমান ইসলামি চিহ্নগুলির মিডিয়াবাহিত রূপের আয়নায়। ভারতবর্ষে হিন্দু–মুসলিমের কৌমের সামাজিক টানাপোড়েন তথা ছোটো বড়ো দাঙ্গা হাঙ্গামার সামান্য অংশীদারী থাকলেও, তা খুব অল্প হলেও এই ‘হিন্দু উদ্বেগ’ ও ‘হিন্দু শাসকের আকুতি’–কে সংহত করলেও, এই দুয়ে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা যেগুলির, সেগুলি প্রত্যক্ষভাবে বর্তমান সামাজিক টানাপোড়েনের মধ্যে নেই। সারনী–২ এ গত কয়েক বছরের দাঙ্গা–হাঙ্গামার পরিসংখ্যান দেওয়া হল। দেখা যাচ্ছে, মোট দাঙ্গা–হাঙ্গামার তুলনায় ধর্মীয়–সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা–হাঙ্গামার শতাংশ অল্প (<২০ শতাংশ) এবং ধর্মীয়–সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা খুব বাড়েওনি ইদানিং। হ্যাঁ, ‘হিন্দু উদ্বেগ’ এবং ‘হিন্দু শাসকের আকুতি’ নামক দুটি প্রতিকৃতির নেপথ্যে আছে মূলতঃ দেশভাগের ইতিহাসের আয়না, এবং দেশের উগ্র জাতীয়তাবাদী মিডিয়ার (যারাই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ) আয়নায় আবিশ্ব সন্ত্রাসবাদ–পাকিস্তান–কাশ্মীর এর ক্রমবর্ধমান ইসলামি চিহ্ন। আয়নাগুলির একটিও আমাদের দৈনন্দিনের

| সারনী ৩ | ২০১৭–১৮ সালে উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের হার |
|---|---|
| জনগোষ্ঠীর ভাগ | জনসংখ্যার শতাংশের তুলনায় উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের শতাংশের অনুপাত |
| অগ্রবর্তী বর্গ | ১.৫১ (জনসংখ্যার ৩০%, উচ্চশিক্ষায় ভর্তির ৪৫.৪%) |
| তপশিলি জাতি | ০.৭৩ (জনসংখ্যার ১৯.৭%, উচ্চশিক্ষায় ভর্তির ১৪.৪% ) |
| তপশিলি উপজাতি | ০.৬১ (জনসংখ্যার ৮.৫%, উচ্চশিক্ষায় ভর্তির ৫.২%) |
| ওবিসি | ০.৮৫ (জনসংখ্যার ৪১.১%, উচ্চশিক্ষায় ভর্তির ৩৫%) |
| মুসলিম | ০.৩৫ (জনসংখ্যার ১৪.২৩%, উচ্চশিক্ষায় ভর্তির ৫%) |

*সূত্র : ২০১৭–১৮ সালের উচ্চশিক্ষার রিপোর্ট* www.aishe.nic.in *তে পাওয়া। জনসংখ্যার শতাংশ ২০১১ –র জনগণনার তথ্য অনুযায়ী। প্রসঙ্গতঃ জাত–জনগণনায় মুসলিমকে আলাদা করে দেখানো হয় না। অগ্রবর্তী বর্গ, তপশিলি জাতি ও উপজাতি এবং ওবিসি — এই ভাগগুলোই শুধু থাকে। মুসলিমরা ওবিসি এবং অগ্রবর্তী বর্গের মধ্যে মিশে থাকে। অপরদিকে মূল জনগণনা, যার রিপোর্ট আলাদা করে বেরোয়, তাতে শুধু ধর্মভিত্তিক ভাগ থাকে। স্বাধীন ভারতবর্ষে কখনো জাত–জনগণনা হয়নি। ২০১১ সালে প্রথম জাত–জনগণনা হয়, লালু মুলায়ম মায়াবতীদের চাপে (বিজেপি বিরোধিতা করেছিল)। ২০১৫ সালে এই জাত–জনগণনার রিপোর্ট অর্ধেক প্রকাশ করা হয়। তার থেকেই জাত–জনগণনার এই শতাংশগুলি পাওয়া যায়। এনএসএসও –র ধারাবাহিক নমুনা সমীক্ষায় এবং উচ্চশিক্ষার রিপোর্টগুলিতে অবশ্য আলাদা করে মুসলিম এবং জাতগত বিভাজনের হিসেব পাওয়া যায়।*

আওতার মধ্যে নয়। সেক্ষেত্রে আমাদের করনীয় কী?

## রক্তমাংসের জাগতিক মুসলমানের কী হাল

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এমনকি হিন্দুদের অবহেলিত জনগোষ্ঠীর তুলনায়ও মুসলিমদের প্রবেশ হার বেশ কম। জনসংখ্যার শতাংশের তুলনায় ২০১৭–১৮ সালেও মুসলিমদের উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিতে উপস্থিতির শতাংশ সবচেয়ে কম (সারণী–৩)

উচ্চশিক্ষায় ভর্তির একট গুরুত্বপূর্ণ মাপক হল (GER) বা গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও (১৮–২৩ বছর বয়সীদের মধ্যে ১০০ জন–এ কতজন উচ্চশিক্ষার কোনো না কোনো ক্ষেত্রে (কলেজ, ইউনিভার্সিটি, ইনস্টিটিউট, এবং আন্ডার গ্র্যাজুয়েট, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট, পিএইচডি) ভর্তি হয়েছে)। ১৮–২৩ বছর বয়সীদের মধ্যে উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের হারের (GER) ক্ষেত্রে ২০১৪–১৫ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, মুসলিমদের ক্ষেত্রে এই হার তপশিলি উপজাতিদের সমান এবং তপশিলি জাতির চেয়ে বেশ কম এবং অন্যান্যদের চেয়ে কম তো বটেই (সারণী–৪) । যদিও ২০০০–০১ এর তুলনায় তা সবারই যথেষ্ট বেড়েছে। গত কয়েকবছর ধরে তলায় তলায় আরেকটি জিনিসও

| সারণী ৪ | গোষ্ঠীগতভাবে যুব-দের উচ্চশিক্ষায় ভর্তির হার | |
|---|---|---|
| জনগোষ্ঠীর ভাগ | ২০০০–০১ GER | ২০১৪–১৫ GER |
| সবমিলিয়ে | ১১.১% | ২৪.৩% |
| তপশিলি জাতি | ৭.৫% | ১৯.১% |
| তপশিলি উপজাতি | ৬.৮% | ১৩.৭% |
| মুসলিম | ৫.২% | ১৩.৮% |

*সূত্র : NSSO র সমীক্ষা রিপোর্ট*

| সারণী ৫ | উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শতাংশ হিসেবে | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| সাল | তপশিলি জাতি | তপশিলী উপজাতি | ওবিসি | মুসলিম | অগ্রবর্তী বর্গ |
| ২০১০ –১১ | ১১.১% | ৪.৪% | ২৭.৬% | ৩.৮% | ৫৬.৯% |
| ২০১১ –১২ | ১২.২% | ৪.৫% | ৩০.১% | ৩.৯% | ৫৩.২% |
| ২০১২ –১৩ | ১২.৮% | ৪.৪% | ৩১.২% | ৪.২% | ৫১.৬% |
| ২০১৩ –১৪ | ১৩.১% | ৪.৬% | ৩২.৪% | ৪.৩% | ৪৮.৯% |
| ২০১৪ –১৫ | ১৩.৪৪% | ৪.৮% | ৩২.৮% | ৪.৫% | ৪৮.৯৬% |
| ২০১৫ –১৬ | ১৩.৯% | ৪.৯% | ৩৩.৭৫% | ৪.৭% | ৪৭.৪৫% |
| ২০১৬ –১৭ | ১৪.২% | ৫.১% | ৩৪.৪% | ৪.৯% | ৪৬.৩% |
| ২০১৭ –১৮ | ১৪.৪% | ৫.২% | ৩৫% | ৫% | ৪৫.৪% |

*সূত্র : উচ্চশিক্ষার রিপোর্ট aishe.nic.in তে পাওয়া।*

হচ্ছে। ভারতবর্ষের মুসলিম সম্প্রদায় একটু হলেও স্বাধীনভাবে প্রস্ফুটিত হতে চাইছে। সাচার কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ হবার পর সরকারি হস্তক্ষেপে একটু হলেও পরিবর্তন এসেছে। নানাভাবে তাকে বারবার উত্যক্ত করা হলেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দিকে সে যেতে চাইছে না একেবারেই। কলেজ শিক্ষার হার বেড়েছে। কলেজে মুসলিম ছাত্রছাত্রীর শতাংশ সামান্য হলেও বেড়েছে (সারনী–৪ ও সারনী–৫ দ্রষ্টব্য)। তবে তা এখনও সব্বার চেয়ে কম। ২০১৭–১৮ সালে যদি ১০০ জন কলেজে ভর্তি হয়, তার মধ্যে হিন্দু অগ্রবর্তী বর্গের প্রায় ৪৫ জন। ওবিসি ৩৫ জন। তপশিলি জাতি ১৪ জন। তপশিলি উপজাতি ৫ জন। মুসলিম ৫ জন।

উচ্চশিক্ষার পর আসা যাক রোজগারের কথায়। রোজগারের ক্ষেত্রেও হিন্দুদের তুলনায় মুসলিমদের শতাংশ বেশ কম (সারনী – ৬)। গত পনেরো বছরে বেকারি বেড়েছে সারা দেশ জুড়ে। বেকারির সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে মুসলিমদের মধ্যে বেশি, হিন্দুদের তুলনায়।

এই সারনী–টি পড়ার সময় সাবধানে পড়তে হবে। এনএসএস এর তথ্যে থাকে LFPR বা লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট এবং WPR বা

| সারণী ৬ | নির্দিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে রোজগেরে–র শতাংশ (বন্ধনীতে বেকারি) | | |
|---|---|---|---|
| সাল | হিন্দু | মুসলিম | অন্যান্য ধর্মাবলম্বী |
| ২০০৪–০৫ | ৪১.২% (৩%) | ৩৩.৫% (৩.২%) | ৪২.১% (৫%) |
| ২০০৯–১০ | ৩৭.৫৬% (২.৫%) | ৩২.৭% (২.৫%) | ৩৯.৬% (৩.৮%) |
| ২০১১–১২ | ৩৯.২% (২.৫%) | ৩২.৮% (৩.৩%) | ৪০.২% (৩.৯%) |
| ২০১৭–১৮ | ৩৫.৫% (৬.৪%) | ২৮.৯% (৭.৫%) | ৩৪.৮% (৮.৫%) |

*সূত্র : এনএসএস, পিএলএফএস ২০১৭–১৮। শহর এবং গ্রামের* শতাংশ–সংখ্যাগুলিকে সরল গড় করে প্রাপ্ত শতাংশ–সংখ্যা।

ওয়ার্কার্স পার্টিসিপেশন রেট। প্রথমটির মানে হল, কোনো নির্দিষ্ট জন–এর মধ্যে কতজন রোজগার করতে চায়, তার শতাংশ হার। আর দ্বিতীয়টির মানে হল, কোনো নির্দিষ্ট জন–এর মধ্যে কতজন রোজগার করতে পারছে, তার শতাংশ হার। এর ফারাকই হল বেকারির হার। স্পষ্টত:ই মুসলিমদের মধ্যে হিন্দুদের তুলনায় সাড়ে ছয় শতাংশ কম রোজগেরে। এবং একইসাথে, বেকারিও এখন বেশি এক শতাংশ–বিন্দুর চেয়েও (সারনী – ৬)।

২০০৬ সালে সাচার কমিটির রিপোর্টে দেখা গেছিল, মুসলিমদের খরচের হার হিন্দুদের চেয়ে কম তো বটেই, শহরাঞ্চলে এমনকি তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের থেকেও কম। যা দেখায়, মুসলিমদের মধ্যে দারিদ্র্য হিন্দুদের এমনকি সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া অংশগুলির তুলনাতেও বেশি। কিন্তু উচ্চশিক্ষা ও চাকরিক্ষেত্রে মধ্যে তপশিলি জাতি (জনসংখ্যার ১৯–২০ শতাংশ, ২০১১ র জনগণনা) র সংরক্ষণ ১৫ শতাংশ। তপশিলি উপজাতিদের (জনসংখ্যার ৮–৯ শতাংশ, ২০১১ জনগণনা) সংরক্ষণ ৭.৫ শতাংশ। ওবিসিদের (৪১ শতাংশ, ২০১১ র জনগণনা) মোট সংরক্ষণ ২৭.৫ শতাংশ। অন্যদিকে মুসলিমদের (জনসংখ্যার ১৪–১৫ শতাংশ, ২০১১ জনগণনা) জন্য ওবিসি–র মধ্যে থেকেই ৪.৫ শতাংশ সংরক্ষণ ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সরকার ২০১১ সালে। প্রসঙ্গত মুসলিমদের মোট জনসংখ্যার (পদবী অনুযায়ী) মাত্র ৪০ শতাংশ এই ওবিসি সংরক্ষণের আওতাধীন, বাকি ৬০ শতাংশ এই ওবিসি সংরক্ষণের আওতাধীন নয় (২০১১ জনগণনা), অসংরক্ষিত। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এগুলি সবই কেন্দ্র সরকারের সংরক্ষণের হিসেব। রাজ্যভিত্তিতে তপশিলি ইত্যাদি জন–শতাংশ–সংখ্যা অনুযায়ী এই হার বিভিন্ন।

আমাদের দেশে সামাজিক টানাপোড়েনের মধ্যে 'হিন্দুর উদ্বেগ'–এর কোনো জাগতিক উৎস নেই। মুসলিমরা হিন্দুদের চেয়ে বিত্ত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জমি, ব্যবসা, খরচ, চাকরি, রোজগার — সমস্ত দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে। ২০০৬ সালে প্রাক্তন বিচারপতি রাজেন্দ্র সাচার তার রিপোর্টে সেটা স্পষ্ট

করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, নানা এনএসএস সমীক্ষা উল্লেখ করে। এবং গত পনেরো বছরে তাদের এই অবস্থার কোনো তুলনামূলক উন্নতি ঘটেনি। সমীক্ষা রিপোর্টগুলি থেকে তা স্পষ্ট। বরং মুসলিমদের এই পিছিয়ে থাকা আমাদের দেশের সামগ্রিক জনসমাজ–কে, আমাদের দেশকে পিছিয়ে দিচ্ছে অনেকটা।

বিজেপি–র নেপথ্যের 'হিন্দু উদ্বেগ'–এর উৎস, আগেই যেটা বলা হয়েছে, নেপথ্যে আছে দেশভাগের ইতিহাসের আয়না, এবং দেশের উগ্র জাতীয়তাবাদী মিডিয়ার (যারাই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ) আয়নায় আবিশ্ব সন্ত্রাসবাদ–পাকিস্তান–কাশ্মীর এর ক্রমবর্ধমান ইসলামি চিহ্ন। সেই আয়নাগুলি দিয়ে বাস্তবকে দেখার ফলে তৈরি হচ্ছে এই অলীক উদ্বেগ। কিন্তু আগের পরিচ্ছদ–এই স্পষ্ট, জাগতিক দৃষ্টিতে হিন্দুদের মুসলিমদের ভয় পাবার তো কিছু নেইই, বরং হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবার আছে। ইকুইটির জন্য। সমতার জন্য। সামগ্রিক সমৃদ্ধির জন্য।

আমাদের যত ছোটো বড় উদ্যোগ, আন্দোলন, সক্রিয়তা, ব্যক্তিগত আলাপচারিতা, সম্ভাষণ, বন্ধুত্ব, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন, ব্যবসা, সরকারিতা, মিডিয়া — সেগুলি যদি আয়নাগুলির উপস্থাপনার আদলগুলির বদলে ভারতবর্ষের জাগতিক তথা রক্তমাংসের মুসলিমদের সম্প্রদায়গত স্বাধীন বিকাশকে, তার স্ফুটনকে জায়গা দিতে না পারে, একে তাদের অংশ ও অবিচ্ছেদ্দ্য অঙ্গে পরিণত করতে না পারে, তাহলে 'হিন্দু উদ্বেগ'–এর প্রতিকৃতি বা ইমেজের আগ্রাসন থেকে সে–ও রেহাই পাবে না।

রেহাই যদি না পায়, তাহলে কী হবে? আয়নাগুলি যেভাবে মুসলিম–জাহান–কে দেখাচ্ছে, তার নেপথ্যে, অর্থাৎ, নেপথ্যের নেপথ্যে মুসলিম–জাহানে যেভাবে স্বাধীনতা, স্বকীয়তা, স্বরক্ষা এবং বৈচিত্র্যের বিকাশ ঘটছে — যা অনেকটাই আগামী পৃথিবীর রূপ নির্মাণে ভূমিকা নেবে — তা দেখতে পাবে না, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবে। এক সন্দেহপরায়ন একলা মানুষের মতো — যে প্রচারের আয়নায় দেখা প্রতিকৃতির উদ্বেগে এমনকি নিজের স্বজনদেরও বিশ্বাস করে না। কৃত্তিবাসী রামায়ণের রামচন্দ্রের মতো যে উদ্বিগ্ন সন্দেহপরায়ন পুরুষ স্ত্রী সীতার গর্ভসঞ্চারকেও সন্দেহ করে। এবং সেই সন্দেহ মেটে না আজীবন।

# বিজেপির কারণ ৩ : স্বজাতের বাসনা

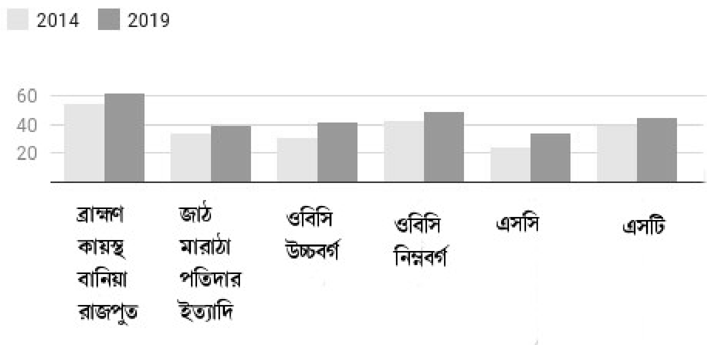
মানুষ কেন বিজেপির দিকে ঝুঁকছে ? শুধু ভোট দিচ্ছে — এমন নয়। সেই কারণ খতিয়ে দেখতে দেখতেই বোঝা গেল — ভারতবর্ষের জাত–ব্যবস্থা — যা একসময় একটা বড়ো অংশের আঞ্চলিক দল এবং সত্তর দশক থেকে জনতা দলের রাজনৈতিক উত্থানের পেছনে ছিল — তা এখন পুরোটাই বিজেপির খেলার সাথিতে পরিণত হয়েছে। কিছুদিন আগে পার্লামেন্টে বক্তৃতা করার সময় জাত–ব্যবস্থা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, ভারতবর্ষের দুটিই জাত — বড়লোক আর গরীব। উনার পার্টি এবং রাজনীতি কিন্তু এই জাত–ব্যবস্থা থেকেই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছে। তার রিটার্ন যদি উনি না দেন, তাহলে বিপদ আছে।

বিজেপির সবচেয়ে শক্তিশালী এবং মতাদর্শগত ভিত্তি হল ব্রাহ্মণ ও কায়স্ত সহ অগ্রবর্তী জাত। সিএসডিএস–এর একটি সমীক্ষা কয়েক বছর আগে দেখিয়েছিল, বিজেপির ক্যাডার এবং নেতারা মূলতঃ এই ব্রাহ্মণ এবং কায়স্ত জাতের থেকে উঠে আসা। ২০১৯ সালের নির্বাচনের পর সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ব্রাহ্মণ–বানিয়া–রাজপুত–কায়স্থ–দের মধ্যে বিজেপির সমর্থন চল্লিশ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬১ শতাংশের পৌঁছে গেছে। স্পষ্টতঃই বোঝা যায় — এই অংশের মধ্যে বিজেপি–র রাজনীতি একটি স্থায়ী ভিত্তি পেয়েছে।

অগ্রবর্তী জাতগুলির মধ্যে বাকি থাকে কৃষক–জাত গুলি — পতিদার, মারাঠা, জাঠ — ইত্যাদিরা। কয়েকবছর ধরেই কৃষির দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার কারণে এই কৃষক জাতগুলি সরকারি চাকরি এবং উচ্চশিক্ষায় নিজেদের জাতের জন্য সংরক্ষণের দাবি তুলছে। কৃষি ভারতবর্ষের সমস্ত ক্ষেত্রে মধ্যে সবচেয়ে কম বৃদ্ধির ক্ষেত্র, অতএব কৃষিতে যারা থাকবে, তারা অন্যান্য

পেশায় যারা আছে, তাদের তুলনায় গরীব হবে। ফলতঃ জমির মালিক এবং অগ্রবর্তী এই কৃষক–জাত সমূহ গ্রামীন অর্থনীতিতে গরীবতর হচ্ছে — স্রেফ কৃষিতে থাকার কারণে। নিজেদের জাতের উন্নতির জন্য তারা মহারাষ্ট্রে মারাঠা আন্দোলন, গুজরাটে পতিদার আন্দোলন এবং উত্তর ভারতে জাঠ আন্দোলন করেছে। সমস্ত আন্দোলনগুলোই গণ–আন্দোলন রূপে হয়েছে এবং সময়ে সময়ে হিংস্র–ও হয়ে উঠেছে। এই সমস্ত আন্দোলন প্রথমদিকে বিজেপি বিরোধী থাকলেও ক্রমে আস্তে আস্তে বিজেপি সংবিধানের তোয়াক্কা না করে 'অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া বর্গ'–এর (ইবিসি) সংরক্ষণের নামে এদের দশ শতাংশ সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করে। মহারাষ্ট্র, গুজরাট ইত্যাদি রাজ্যে আলাদাভাবে সংরক্ষণের কথা ঘোষিত হলেও লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে কেন্দ্রীয়ভাবে এই সংরক্ষণের ঘোষণা করে এবং রেল সহ অন্যান্য পরীক্ষার জন্য ফর্মে এই মর্মে একটি কলাম–ও রাখে। কিন্তু এই অগ্রবর্তী কৃষক–জাতগুলির সংরক্ষণের ব্যবস্থা কি 'বিজেপির বিজয়ের কারণ'–এর মধ্যে ঢুকবে না? তা কি 'বিজেপি–র কারণ'–এর মধ্যে আসবে? এইসব প্রশ্নের পরে উত্তর দেওয়া যাবে। আপাতত এই লোকসভা নির্বাচনে অন্যান্য জাতগুলির সমর্থন কতটা বিজেপির দিকে গেছে, তার তথ্যগুলি নেওয়া যাক। নিচের ছবিটি সিএসডিএস–এর সমীক্ষা রিপোর্টের ওপর সঞ্জয় কুমার — প্রণব গুপ্ত –র লাইভমিন্ট পত্রিকার ওয়েবসাইটে ৩ জুন ছাপা হওয়া প্রতিবেদন থেকে নেওয়া।

বেশ কিছুদিন ধরেই জাত–রাজনীতিতে ওবিসি বা 'অন্যান্য পশ্চাদপদ বর্গ' এর অন্তর্গত যারা তারা বিজেপির একটি শক্তপোক্ত ঘাঁটি। সিএসডিএস ওবিসি–কে দুই ভাগে ভাগ করেছে। ভারতের জনসংখ্যার প্রায় পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি ওবিসি বলে বলা হয়, মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট মোতাবেক, যদিও এনএসএস এর সমীক্ষা এবং ২০১১ সালের জাত–জনগণনা উভয়তেই পাওয়া যায় – এই সংখ্যা ৪১ শতাংশের মতো। কেন্দ্রীয়ভাবে ওবিসি সংরক্ষণ ২৭ শতাংশের মতো। এই ওবিসি ক্যাটেগরির মধ্যে কিছু জাত–এর (যেমন, বিহার ও উত্তরপ্রদেশে যাদব এবং কুর্মীরা, পশ্চিমবঙ্গ বিহার ওড়িশায় মাহিষ্য–রা, কর্ণাটকে ভোক্কালিগা–রা) জনসংখ্যা ওবিসি জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ। কিন্তু গ্রামীন অর্থনীতিতে এদের জোর বেশি, কৃষিজমির মালিকানা এদের বাকি ওবিসি–র অন্তর্গত জাতগুলির তুলনায় অনেক বেশি। এদের ওবিসি উচ্চবর্গ ধরা হয়। এবং বাধিয়া লোহার কেওয়াত ইত্যাদি যে জাতগুলি ওবিসি জনসংখ্যার সিংহভাগ বা দুই তৃতীয়াংশ, কিন্তু জমির মালাকানা খুবই কম — তাদের ধরা হয় ওবিসি নিম্নবর্গ হিসেবে।




চিত্র ১ : সিএসডিএস এর সমীক্ষা অনুসারে বিজেপির সমর্থন। লাইভমিন্ট পত্রিকার ওয়েবসাইটে ৩ জুন প্রকাশিত। জনসংখ্যার হিসেবে ওবিসি নিম্নবর্গগুলি মোট জনসংখ্যার ২৭ শতাংশের মতো। এই বর্গটি সবচেয়ে বড়। তারপরেই আছে তপশিলি জাতগুলির আয়তন – প্রায় ১৭ শতাংশ। জাঠ মারাঠা পতিদার–রা বড়ো জমির মালিক চাষি – মোট জনসংখ্যার ১৩ শতাংশের মতো। অপরদিকে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বানিয়া রাজপুত দের যে অগ্রবর্তী বর্গ – জনসংখ্যার তার আয়তন ৮ শতাংশের মতো। ওবিসি উচ্চবর্গ–ও জমির মালিক চাষি, মাঝারি মাপের জমির মালিক। জনসংখ্যায় এদের আয়তন ১৩ শতাংশের কাছাকাছি। তপশিলি উপজাতি তথা আদিবাসীদের আয়তন জনসংখ্যার ৯ শতাংশের মতো। চিত্রটি ঈষৎ সম্পাদিত (জনসংখ্যার বাকি ১৩ শতাংশ মুসলিম, আদের বিজেপি–কে ভোটের হারের কলামটি এই আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক বলে বাদ দেওয়া হয়েছে)

ওবিসি সংরক্ষণের রাজনীতি সত্তর দশক থেকে শুরু হয়েছে। প্রথমবারের জন্য যখন কেন্দ্রে অকংগ্রেসী সরকার তৈরি হয়, ১৯৭৭ সালের মোরারজী দেশাই–এর নেতৃত্বাধীন জনতা সরকার, সেই সরকারে নানাভাবে অংশীদার ছিল এখনকার বিজেপির পূর্বসূরীরা। তখনই তপশিলী জাতি এবং উপজাতি বাদ দিয়েও মূলতঃ কৃষক যে জাতগুলি ছিল তাদের উচ্চশিক্ষা ও চাকরিতে সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করার জন্য তৈরি হয় মণ্ডল কমিশন। ফের নয়ের দশকে কংগ্রেস সরকারের পতনের মাধ্যমে জনতা সরকার আসলে মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসে এবং ওবিসি সংরক্ষণের জমি প্রস্তুত হয়। ফলতঃ ওবিসি রাজনীতিতে বিজেপির রাজনৈতিক পূর্বসূরীরা অনেকদিনই হাত পাকিয়েছে।

## ওবিসি নিম্নবর্গ

এই ওবিসিদের মধ্যে যারা নিম্নবর্গ — ওবিসি সংরক্ষণের সুফল তারা পায়নি, পেয়েছে ওবিসিদের মধ্যে যারা উচ্চবর্গ, কেবল তারাই। তথ্যভিত্তিক

না হলেও ওবিসি–র অন্তর্গত জাতগুলির মধ্যে ধারনা এমনই। এই ধারনা সম্প্রতি ভাষা পেয়েছে জাস্টিস রোহিনী কমিটির রিপোর্টের মধ্যে। ২০১৭ সালের শেষের দিকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ওবিসি–দের মধ্যেও যারা নিম্নবর্গ — তাদের চিহ্নিত করার জন্য জাস্টির রোহিনীর নেতৃত্বে একটি কমিটি করে। সেই কমিটি বিস্তারিত সমীক্ষার জন্য প্রচুর ফান্ড দাবি করে, এবং সেই সমীক্ষা না করেই এইবারের লোকসভা নির্বাচন চলাকালীনই ঘোষণা করে দেয় — ওবিসিদের মধ্যেও যারা নিম্নবর্গ — তাদের পৃথক সংরক্ষণ প্রয়োজন ওবিসি সংরক্ষণের মধ্যেই। কমিটির দাবি অনুসারে — কুর্মী যাদব ইত্যাদি কয়েকটি উচ্চবর্গের জাত বাদ দিলে ওবিসি সংরক্ষণের আওতায় পড়ে এরকম প্রায় ১৯০০ জাত আছে, যারা এতদিনকার ওবিসি সংরক্ষণের ৩ শতাংশ মাত্র হয়ে থেকেছে। ফলতঃ এই ওবিসি নিম্নবর্গ ১৯০০ জাতের সংরক্ষণ চাই — ৮–১০ শতাংশ।

ওবিসি সংরক্ষণের মধ্যে থেকে যে রাজনৈতিক, চাকরি–বাকরি এবং উচ্চশিক্ষায় একটা বড় অংশ বাদ গেছে, সুবিধা নিয়েছে ওবিসি–দের মধ্যের কিছু শক্তিশালী জমিওয়ালা কৃষক জাত — তার একটি সুন্দর পরিসংখ্যান পাওয়া যায় ভারতীয় সামাজিক পার্টির আর কে সাইঁ এর একটি বক্তব্যে। হরিয়ানার এমএলএ এবং এমপি–দের পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি বলেছিলেন,

> *কৃষির সঙ্গে জড়িত সমস্ত জাতগুলো সুবিধা পেয়েছে। যাদব, কুর্মী, মেও, গুজ্জর — সবাই সুফল ভোগ করেছে এবং আমরা কিছু পাইনি। হরিয়ানাতে ১৮ জন ওবিসি এমএলএ আছে। তাদের মধ্যে যাদব, কুর্মী, মেও, গুজ্জর আছে ১৫ জন। এই জাতগুলির মধ্যে থেকে মোট ৩ জন এমপি–ও আছে। হরিয়ানার মোট জনসংখ্যার ৭ শতাংশ এই জাতগুলির অন্তর্গত। এছাড়া ওবিসি–র মধ্যে পড়ে এরকম আরো ৬৭ টি জাত আছে, এবং তারা হরিয়ানার মোট জনসংখ্যার ৩৬ শতাংশ। কিন্তু হরিয়ানার ৯০ জন এমএলএ র মধ্যে এরা মাত্র ৩ জন। এদের মধ্যে থেকে একজনও এমপি নেই।*

এইবারের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি এই ওবিসি–দের মধ্যে যে নিম্নবর্গ — তাদের মধ্যে নিজেদের ঘাঁটি তৈরি করে ফেলার সুবিধা পেয়েছে। রোহিনী কমিটি গঠন, রোহিনী কমিটির সুপারিশ, এবং তারও আগে মন্ডল কমিশন এবং ওবিসি সংরক্ষণের ইতিহাসের সঙ্গে নিজেদের জড়িত থাকা এবং

যেহেতু মণ্ডল কমিশন ও ওবিসি সংরক্ষণ লাগু করেছিল জনতা সরকারগুলি যেখানে সংঘ পরিবারের প্রতিনিধিরা নেতৃত্বে ছিল না, আশেপাশে ছিল, তাই ন্যায়বিচার হয়নি — এই বাচন তৈরি করে ওবিসি নিম্নবর্গের মধ্যে জমি পেয়েছে বিজেপি। যে স্বজাতের বাসনা রাজনৈতিক স্বীকৃতি পেয়েছিল পূর্বতন জনতা সরকারগুলির আমলে — সেখানে সমালোচনামূলক অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

প্রসঙ্গতঃ, আমাদের দেশে প্রথম জাত–জনগণনা হয় ১৯৩১ সালে। পরে ১৯৫১ সালে আরেকটি জাত–জনগণনা হয়, কিন্তু তার ফল প্রকাশ করা হয়নি। তারপর ২০১১ সালে লালু–মুলায়ম–মায়াবতীদের চাপাচাপিতে মনমোহন সিং এর সরকার আবার জাত জনগণনা করে। এই জাত–জনগণনাটি হয়েছিল সম্পূর্ণ পেপারলেস বা কাগজকলম না নিয়ে এবং অডিও রেকর্ডিং–এর মাধ্যমে। এতে মানুষকে গণনাকারীদের কাছে তাদের জাত বলতে বলা হয়েছিল। পরে এই জাত–জনগণার কাঁচা তথ্য পাঠানো হয় রাজ্যগুলির কাছে, কারণ দেখা যায়, এই গণনায় প্রচুর ভুল রয়েছে, সংখ্যায় তা দশ লক্ষেরও বেশি। রাজ্যগুলি সেই ভুলগুলি সংশোধন করে পাঠানোর পরও দেখা যায় লক্ষাধিক ভুল রয়ে গেছে। ২০১৫ সালে এই জাত–জনগণনার রিপোর্ট আংশিক প্রকাশিত হয়, তাতে অর্থনৈতিক নানা তথ্য দেওয়া হলেও জাত সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য বাদ দেওয়া হয়। অর্থাৎ সরলভাবে বললে, জাত–জনগণনার রিপোর্ট চেপে দেওয়া হয়। বিহার উত্তরপ্রদেশের মূল ধারার রাজনৈতিক দলগুলি এই তথ্য প্রকাশ্যে আনার জন্য সরকারকে চাপ দেয় — কিন্তু কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এই তথ্য প্রকাশ করেনি। উল্টোদিকে এই বিজেপি সরকারই কিন্তু ২০২১ সালের জনগণনায় জাত–কে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছে। যদিও ২০১১ সালের জনগণনায় জাত–কে অন্তর্ভুক্ত করার তারা বিরোধিতা করেছিল।

আদিবাসীদের মধ্যে বিজেপির সমর্থন দীর্ঘদিনের। একইসাথে তপশিলি জাতি বলে যারা পরিচিত সেই সমস্ত জাতগুলির মধ্যেও বিজেপির ভিত্তি তৈরি হয়েছে। আদিবাসী এবং তপশিলিদের মধ্যে বিজেপির ভিত্তি নিয়ে আলোচনা আগেও বিভিন্ন জায়গায় হয়েছে। মূলতঃ হিন্দু মূলস্রোতে ঢুকে পড়ার বাসনাকে পুঁজি করে বিজেপি ভিত্তিস্থাপন করেছে এদের মধ্যে, এরকমই ভাবা হয়। আদিবাসী এবং তপশিলি জাতির বিভিন্ন জাতসমূহের স্বজাতীয় বাসনা যদিও আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে নানাভাবে। আশা করা যায়, আগামীদিনে সেই বাসনা 'হিন্দু মূলস্রোতে ঢুকে পড়া'র বাসনাকে অতিক্রম করতে পারবে।

স্বজাত রাজনীতি কীভাবে বিজেপি করেছে, তা ফুটে ওঠে উত্তরপ্রদেশের কনৌজ-এ নরেন্দ্র মোদির একটি ভাষণের অংশে —

> *আমার জাত এতই ছোটো এতই ছোটো যে গ্রামে গ্রামে এক ঘর করেও হয়ত পাওয়া যাবে না। আর আমি তো পশ্চাদপদ না, অতি পশ্চাদপদ ঘরে জন্মেছি।*

**আত্মপরিচয়ের রাজনীতি**

আমাদের মনে হয়েছে, এই বিজেপির নানা ধরনের জাতভিত্তিক সমর্থনের একটা বড় কারণ মানুষের স্বজাতের বাসনা। জাত কথাটার মধ্যেই আছে আত্মপরিচয়ের একটি ঠিকানা — যা জন্মগত। আমাদের দেশে জাত-এর একটি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ভিত্তি রয়েছে। জাতের ওপর আমাদের নিজেদের কোনো হাত নেই, তা জন্মগত পাওনা। জন্মগত-কে পেরিয়ে যাওয়া যেমন জীবনের ধর্ম, তেমনি জন্মগত-র আবেগও খুব স্বাভাবিক মানবধর্ম — কারণ বোধবুদ্ধি হবার আগে অবদি মানুষ ওই জন্মগত পরিমণ্ডলেই তার শৈশব এবং কৈশোর অতিবাহিত করে — এক অসহায়তার মধ্যে ওম পায় সেই জন্মগত পরিমণ্ডল থেকেই। আমাদের শিক্ষার মধ্যে বেশিরভাগটাই সমাজ থেকে, বিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও। সেই সামাজিক শিক্ষার অনেকটাই আমাদের হয় ওই জন্মগত পরিমণ্ডলে। তাই স্বজাত-এর প্রতি যে আবেগনির্ভর টান থাকে এবং থেকে যায় তা অনস্বীকার্য। তারপর বড় হবার মধ্যে দিয়ে মানুষ তার জন্মগত পরিমণ্ডলের সীমাবদ্ধতা চিনতে পারে, তাকে অতিক্রম করতে চায়। এই টানাপোড়েন থাকে জীবনভর।

বিজেপি-র রাজনীতি আত্মপরিচয়-নির্ভর। ভারতবর্ষের বেশিরভাগ রাজনৈতিক আদর্শ যখন সর্বমঙ্গলের পথে হাঁটে — তখন বিজেপি উল্লেখযোগ্যভাবে আত্মপরিচয়ের ওপর দাঁড়িয়ে তার রাজনীতিকে সাজানোর চেষ্টা করেছে। এই আত্মপরিচয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জাত। আমি কে? — এই প্রশ্নের উত্তরে যা আসে। নিজের সংস্কৃতি, নিজের পাড়া, নিজের চারপাশ, নিজের শৈশব কৈশোরের ওপর দাঁড়িয়ে যে রাজনীতি এইই বিশ্বায়ন-উত্তর পৃথিবীতে সংস্কৃতির প্রাচুর্য্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার জমি দেয় — তার সহিষ্ণু এবং অপরের প্রতি আত্মীয়তা ভিত্তিক কোনো রাজনৈতিক প্রকাশের অনুপস্থিতিতে বা দুর্বলতায় — বিজেপির বিদ্বেষের রাজনীতির মধ্যেই সে আজ আশ্রয় খুঁজেছে।

## চাই সমতার প্রেক্ষাপট

এর প্রতিরোধ যদি করতে হয়, তাহলে মানুষের স্বজাতের বাসনা–কে মর্যাদা দিতে হবে। আত্মপরিচয়ের রাজনীতি বিদ্বেষের প্রেক্ষাপটে নিঃসন্দেহে কানাগলি, কিন্তু আত্মপরিচয়ের রাজনীতি অপরের প্রতি আত্মীয়তা ও সহিষ্ণুতার প্রেক্ষাপটেও হতে পারে। এই প্রেক্ষাপট নির্মাণে সবচেয়ে সাহায্য করতে পারে ইকুইটি বা সার্বিক সমতার ধারনা। সমতা আর সমানতা এক নয়। সমানতা–তে মনে করা হয় প্রতিটি মানুষ সমান এবং কাউকে কোনো বিশেষ সুবিধা দেওয়া উচিত না। কিন্তু সমতার ধারনা সে কথা বলে না। সমতার দৃষ্টিতে সব মানুষ সমান নয়। মানুষ তার কৌম ও সামাজিক উৎসের কারণে নানা প্রতিবন্ধকতা নিয়ে থাকে। সেই প্রতিবন্ধকতার মূল কারণ, শিক্ষা–স্বাস্থ্য–কাজ–বিত্ত–ব্যবসা–সুপরিবেশ–অবকাশ–ভ্রমণ ইত্যাদির যে জগৎ — সেই জগৎ সমান নয় — সেই জগৎ বা দুনিয়া — সেখানে আগে যারা ঢুকেছে তারাই তৈরি করেছে এবং স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের সুযোগসুবিধার কথা ভেবেই তৈরি করেছে। প্রয়োজন সেই জগৎগুলিতে বাকিদের বিশেষ সুবিধার মধ্যে দিয়ে ঢোকা নিশ্চিত করা এবং একইসাথে এই জগৎগুলির হালচালও বদলানো যাতে তা সেখানে আগে যারা ঢুকে পড়েছিল, তাদের বাগানবাড়ি না হয়ে থাকে আর।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আমাদের বাংলা মাধ্যমের বইগুলিতে যে বাংলা ভাষায় লেখা থাকে সেটা শান্তিপুরী বা কলকাতার বাংলা ভাষা — সেটাই মান্য বাংলা ভাষা। তার কারণ বাংলায় লেখাপড়ার জগৎ ছিল এই গাঙ্গেয় বঙ্গের শহরবাসীর দখলে। কিন্তু এই ভাষার পাঠ্যপুস্তকে উত্তরবঙ্গের একজন বাংলাভাষী সমস্যায় পড়ে, এমনকি দক্ষিণবঙ্গের গ্রামবাংলার শিক্ষার্থীও সমস্যায় পড়ে, কারণ তার জন্মগত কারণে যে চেনা শব্দভাণ্ডার তার থেকে মান্য বাংলায় যে পাঠ্যপুস্তক, তার শব্দরাজি অনেকটাই আলাদা। সমতার ধারনা, যে সমস্ত বাংলাভাষীর মাতৃভাষা লিখ্য বা মান্য বাংলা নয় — পড়াশুনা বা চাকরিবাকরিতে তাদের আলাদা সুবিধা দেওয়ার সুপারিশ করবে, কারণ বিজাতীয় ভাষায় শিক্ষালাভের প্রতিবন্ধকতা পেরোতে হয়েছে তাকে। একইসাথে, সমতার ধারনা, পাঠ্যপুস্তকেও মান্য বাংলা শব্দের ব্যবহার কমিয়ে গ্রামবাংলার ভাষা এবং বাংলার প্রান্তের শব্দভাণ্ডার বাড়ানোর কথা বলবে। এইরকম।




চিত্র ১ : সমতা বনাম সমানতা

# সমতার ইস্তাহার

সমতা আর সমানতা এক নয়। ওপরের ছবিতে এই দুই–এর মধ্যে ফারাক স্পষ্ট। আমরা সমানতার বদলে সমতাভিত্তিক কিছু ব্যবস্থা চাইছি।

১) বর্তমান ভারতে সমতা নেই। জাত–ধর্ম–লিঙ্গ–শ্রেণী–বর্ণ–জাতিসত্ত্বা–ভৌগলিক অবস্থান ইত্যাদি ভেদ–এ কারোর বেশি সম্পদ তো কারোর কম। কারোর শিক্ষার হার বেশি তো কারোর কম। কারোর চাকরি বেশি, ব্যবসা বেশি। কারো কম। কারো স্বাস্থ্য ভালো, কারো মন্দ। ফলতঃ আমরা সমতার ইস্তাহার তৈরিতে বাধ্য হচ্ছি। এই ইস্তাহার

একটি উদ্দেশ্য নিয়ে, তা হল এই যে অসমতা — তার অবসান।

২) ভেদাভেদ নানা প্রকার। ভেদাভেদ বরাবর বিদ্বেষও আছে ষোলো আনা। তাই ভেদাভেদগুলি এড়িয়ে যাওয়া ঠিক না। আমরা মনে করি, ভেদাভেদগুলি একে অন্যের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান নিয়ে তখনই চলতে পারবে, যখন অসমতা ঘুঁচে গিয়ে সমতা আসবে। নচেৎ পারস্পরিক হিংসা ও বিদ্বেষ অনিবার্য, তাই সমতার ইস্তাহার এই পারস্পরিক বিদ্বেষ কাটানোরও একটা উপায়।

৩) ধর্মের দিক দিয়ে দেখলে ভারতে প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু বলে নিজেদের পরিচয় দেন। দেখা যায়, শিক্ষা স্বাস্থ্য সব দিক দিয়েই হিন্দুরা এগিয়ে মুসলমানদের তুলনায়, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের তুলনায়। তাই মুসলিমদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকরি, রোজগার, ব্যবসা, বাসস্থান ইত্যাদি উন্নয়ন সূচকে অমুসলিমদের সমপর্যায়ে আনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা (সংরক্ষণ, ইনসেনটিভ ইত্যাদি) নিতে হবে। মুসলিমদের মধ্যে অপরাধের হার বেশি। তা কমাতেও সাহায্য করবে এই বিশেষ ব্যবস্থা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও উক্ত বিশেষ ব্যবস্থা চাই।

৪) লিঙ্গের দিক দিয়ে পুরুষ ও মহিলার (এবং অন্যান্য লিঙ্গের) ফারাক উল্লেখযোগ্য। সেই ফারাক সমস্ত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক পরিসর এবং সমস্ত জায়গায় ঘোঁচাতে হবে। এবং তার জন্য মেয়েদের দিকে টেনে নানা ব্যবস্থা করতে হবে, সংখ্যা অনুপাতে সংরক্ষণ ইনসেনটিভ ইত্যাদি ব্যবস্থার পাশাপাশি।

৫) জাতের দিক দিয়ে এসসি এসটি ওবিসি রিজার্ভেশনের একটা ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এইসমস্ত ক্যাটেগরির মধ্যে পড়ে যে বিপুল সংখ্যক জাত, যাদের সাব–কাস্ট বলা হয়, তার মধ্যে দিয়ে যেন ভাবা হয় এসসি একটা জাত, আর তার অন্তর্গত কোনো একটা জাত হল এসসি–র সাব কাস্ট। এই ধারনা ভুল। এসসি, এসটি, ওবিসি এগুলো অফিসিয়াল বা সরকারি নাম মাত্র। আসল জাত হল, কুর্মী, মাহাতো, সাঁওতাল, লোধা, শবর, জাঠ, পতিদার ইত্যাদি। এসসি, এসটি, ওবিসি নামক সরকারি বন্ধনী দিয়ে নয়, জাতকে তার নিজস্ব জাত হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সংখ্যাগত অনুপাতে সুবিধার (সংরক্ষণ, ইনসেনটিভ ইত্যাদি) বন্দোবস্ত করতে হবে শিক্ষা, চাকরি, রাজনীতি সহ সর্বত্র।

৬) যে কোনো রাষ্ট্রীয় কাঠামো, রাজ্য বা প্রদেশ, স্বশাসিত অঞ্চল, সার্বভৌম দেশ — সেগুলোর মধ্যেও সমতা নেই, অথচ এক ধরনের সমানতার প্রত্যাশা আছে, ফেডারেলিজম, সীমানা, রাষ্ট্রসঙ্ঘ ইত্যাদি ধারনার মাধ্যমে। সেখানেও মানবোন্নয়নের সূচকে সমতার ধারনা সর্বাগ্রে প্রযোজ্য হবে — জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেমবাদ ইত্যাদির চেয়ে।

৭) শিক্ষা, যোগাযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকা নির্ধারক। ফলতঃ উন্নয়নের এই নিরিখগুলিতে ভাষাগত অসমতা, যা কি না বৈষম্যের রূপে আসে – এই ভাষাগত অসমতা দূরীকরণে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৮) সমস্ত সামগ্রিক স্বার্থের কাজ – যেমন পরিবেশ রক্ষা, জৈব চাষ, শরীরচর্চা, বৃক্ষরোপণ, ত্রাণকার্য — এগুলোতে সরকার ও মানুষের সংগঠনগুলি কাজ করে। এই সমস্ত কাজ এবং উদ্যোগে জাত–লিঙ্গ–শ্রেণী–ধর্ম–ভাষা–জাতি ইত্যাদি ভিত্তিক সমতামূলক অংশগ্রহণ চাই। এগুলির সুফল ভোগও সমতার আদর্শের ভিত্তিতে হতে হবে।

৯) সম্পদের অসম বন্টন এবং এই অসাম্যের বেড়ে চলা আমাদের দেশের এক সমস্যা। হয়ত গোটা পৃথিবীরই। পুঁজিবাদের কারণে এই অসাম্য বেড়েই চলেছে, অর্থনীতিবিদরা তাই দেখাচ্ছেন। সেই সমস্যার নিরসনে এখানেও সমতার আদর্শের প্রয়োজন। বড়লোকদের কাছ থেকে সরাসরি টাকা নিয়ে গরীবদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। এবং এই পুনর্বন্টন চলতেই থাকবে, যতদিন বিত্তবন্টনে অসাম্য থাকবে।

১০) চাকরির বেতনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বেতন এবং সর্বনিম্ন বেতনের মধ্যে তফাতও বড্ড বেশি। এক্ষেত্রেও সমতা প্রয়োজন। দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সাপেক্ষে বেতনের কমবেশি হতে পারে, কিন্তু সর্বোচ্চ বেতন কখনো সর্বনিম্ন বেতনের তিন–চার গুণের বেশি হওয়া চলবে না।

১১) এই ইস্তাহারে উন্নয়নের সূচক বলতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকরি, ব্যবসা, বিত্ত, ক্রয়ক্ষমতা, রাজনৈতিক ক্ষমতা, যোগাযোগের ক্ষমতা, সুপরিবেশ, অবকাশ, ভ্রমণ ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে।

১২) এই ইস্তাহার একটি অস্থায়ী কর্মসূচী। এটা কোনো সংগঠনের কর্মসূচী নয়। কোনো কার্যক্রমও নয়। সাধারণ ইস্তাহার। অনেকটা

নুনের মতো। আমাদের চারপাশের নানা কর্মউদ্যোগের স্বাদ বদল করার ক্ষমতা রাখে এই ইস্তাহার, কিন্তু তা করতে গিয়ে এ সেই কর্মউদ্যোগগুলির মধ্যে নিজের কেলাসিত রূপটি বিসর্জন দেয়, নিজে আলাদা অস্তিত্বে থাকে না। এই ইস্তাহার নিজে কখনোই কোনো কেলাসিত রূপ হয়ে উঠবে না। এই ইস্তাহার মাঝে মাঝে পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংযোজন, বিয়োজন হতে পারে। আপাতত একটা ফেসবুক পেজ–এ এই ইস্তাহারটি থাকতে পারে এবং এই ইস্তাহারের উপযোগী নানা তথ্য সম্বলিত প্রচার সমীক্ষা কথোপকথনের জন্য মাসে একদিন করে কয়েক ঘন্টার জন্য বসা যেতে পারে, ইচ্ছুকদের নিয়ে। এটুকুই তার সংগঠন।

# সমতার ইস্তাহারের ওপর কিছু প্রশ্নোত্তর

সমতার ইস্তাহারের খসড়া পড়ে নানা প্রশ্ন করেন অনেকে। তার মধ্যে থেকে কিছু প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করা হল। এই প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়ে সমতার ইস্তাহারের ধারনা আমাদের কাছেও স্পষ্ট হচ্ছে একটু একটু। একইসাথে পাঠকদের কাছেও স্পষ্ট হচ্ছে আশা করা যায়। প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে দেবার মানে এই নয় যে প্রশ্নগুলি গুরুত্বপূর্ণ নয় বা প্রশ্নগুলি সমাধিত হয়ে গেল। এটা তো কোনো তর্কযুদ্ধ নয় এবং জেতা-হারারও ব্যাপার নয়। উত্তরগুলির মতো, প্রশ্নগুলিও গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী। আরো প্রশ্ন ও উত্তর চলতে চলতে তৈরি হবে আশা করা যায়।

**প্রশ্ন ১ : মানুষকে তার নানা পরিচয়ে ভেঙে ফেলা কি ঠিক ?**

উত্তর : সামাজিক মানুষ নানা পরিচয় দিয়েই পরিচিত হয়। বিশেষতঃ অচেনা ও সামনাসামনি দেখা না হওয়া মানুষের ক্ষেত্রে সেই পরিচয় একটা প্রাথমিক বোঝাপড়া হিসেবে কাজ করে। ফলতঃ অনেকটা এইভাবে বলা যায়, বৃহত্তর সমাজ কোনো ব্যক্তি মানুষকে যখন প্রাথমিকভাবে চেনে, তখন সে তাকে কোনো একটা সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলে চেনে। সেইটাই তার পরিচয়। ব্যক্তি মানুষ অনেক সময় নিজেও চায় সেই পরিচয়ের আশ্রয়। আবার অনেক সময় চায় না। সামাজিক পরিচয় মানুষকে একটা বল-ভরসা দেয়। নিঃসন্দেহে, সামাজিক পরিচয় ব্যক্তিটির নিজস্বতাকে খর্ব করে। সামাজিক পরিচয়ের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ সাজতে হয়। এইজন্য আমরা পরিচয়ের বদলে আত্মপরিচয় শব্দটা ব্যবহার করছি। যাতে যার পরিচয়, সে পরিচয় গঠনে তার নিজের সম্মতিও থাকে অনেকটাই। উদাহরণ স্বরূপ, ধরা যাক,

একজন বাঙালি এবং নারী — দুই পরিচয়ের মধ্যে সে নিজে নারী হিসেবে পরিচিত হতে বেশি চায়। সেক্ষেত্রে তার মূল আত্মপরিচয় — নারী। আবার আত্মপরিচয় শব্দটির মধ্যে সামাজিকভাবে স্বীকৃত পরিচয় ছাড়াও নিজে বানিয়ে নেওয়া পরিচয়ও ঢুকে যায়। যেমন, কেউ একজন পরিচিত হতে চায় সাইক্লিস্ট হিসেবে, বা অভিনেতা হিসেবে, বা কবি হিসেবে। এরকম। আবার আত্মপরিচয় বলেই, তা বদলেও যায় সময়ের সাথে সাথে।

আমরা সমতার ইস্তাহারে কিছু পরিচয়ের অক্ষের কথা বলেছি। যেমন, জাত–ধর্ম–ভাষা–লিঙ্গ–শ্রেণী–বর্ণ–জাতিসত্ত্বা–ভৌগলিক অবস্থান। নিঃসন্দেহে এর চেয়েও বেশি অক্ষ বাস্তবে আছে এবং বানানো আত্মপরিচয়ের অক্ষের কথা বলা হয়নি।

পরিচয়গুলির বেশিরভাগেরই জন্মগত কিছু সামাজিক শিকড় আছে। জন্মগত বলতে কোনো বায়োলজিক্যাল বা জৈব কিছুর কথা বলা হচ্ছে না। জন্মের পর থেকে আমরা শৈশব ও কৈশোরে যে সামাজিক পরিমণ্ডল পাই (যার মধ্যে পারিবারিক–ও অন্তর্ভুক্ত) তাতে আমাদের কোনো ভূমিকা থাকে না। একধরনের অসহায়তার মধ্যে এই সামাজিক পরিমণ্ডল আমাদের উষ্ণতা দেয়, বড়ো করে। আমরা সেই সামাজিক পরিমণ্ডলের বিচার করতে পারি না, বা পছন্দ–অপছন্দ করতে পারি না। জন্মগত বলতে এই শৈশব কৈশোরের সামাজিক পরিমণ্ডলের কথা বলা হচ্ছে। এই সামাজিক পরিমণ্ডল এমনকি অর্থনৈতিক বর্গ (যেমন শ্রেণী) –কেও সামাজিক–সাংস্কৃতিক পরিচয় বানিয়ে দেয়। বড় হবার মধ্যে দিয়ে মানুষ তার জন্মগত পরিমণ্ডলের সীমাবদ্ধতা চিনতে পারে, তাকে অতিক্রম করতে চায়। কিন্তু তা ফিরে ফিরে আসে। এই টানাপোড়েন থাকে জীবনভর। নিজের সংস্কৃতি, নিজের পাড়া, নিজের চারপাশ, নিজের শৈশব কৈশোরের পরিমণ্ডল এই বিশ্বায়ন–উত্তর পৃথিবীতে সংস্কৃতির প্রাচুর্য্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার জমি দেয় — তার সহিষ্ণু এবং অপরের প্রতি আত্মীয়তা ভিত্তিক রাজনৈতিক প্রকাশ জরুরি। বিদ্বেষের পটভূমিতে আত্মপরিচয়ভিত্তিক রাজনীতি নিঃসন্দেহে কানাগলি। সহিষ্ণু এবং অপরের প্রতি আত্মীয়তা ভিত্তিক রাজনৈতিক প্রকাশই সমতার সার্বিক প্রেক্ষাপট।

**প্রশ্ন ২: অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বা শোষণকে কি কম গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না?**

উত্তর : এই ইস্তাহারের গোটাটাই অর্থনীতি ভিত্তিক। শুধু 'অর্থনৈতিকভাবে শোষিত' এবং 'অর্থনৈতিকভাবে শোষক' অথবা 'দরিদ্র' ও 'ধনী' — এইরকম কোনো সামাজিক বিভাজন করা হয়নি, যেরকম বিভাজন অতীতে নানাসময়ে নানা রাজনীতি করেছে, অন্য বিভাজনগুলি না করে। অর্থাৎ অর্থনীতি–কে অক্ষ করে কোনো বিভাজন তৈরি করা হয়নি। বরং সমাজ ও সংস্কৃতি–কে ব্যবহার করা হয়েছে বিভাজনের অক্ষ তৈরি করার কাজে। এর কারণ হল — অর্থনীতি একটি বস্তুগত অবস্থা। তার উপাদানগুলিকে উন্নয়নের সূচকে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থনৈতিক স্তরের মধ্যে সমতাবিধানের কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক বিভাজন করা হয়নি। কারণ, এক, অর্থনৈতিকভাবে 'শোষক' এবং 'শোষিত' — এই স্তর বিভাজনটি এত সরল নয়। লগ্নি ও উৎপাদন/পরিষেবা এত বহুস্তরীয় হয়ে গেছে, যে, খুব কম সংখ্যক মানুষকে পরমভাবে শোষক অথবা শোষিত এই দুই বর্গের মধ্যে ফেলা যায়। তাছাড়া শোষিত–র বোধ যত সহজে ও শক্তপোক্তভাবে আপনজন তৈরি করে, তার চেয়ে অনেক বেশি করতে পারে ওপরে উল্লিখিত আত্মপরিচয়গুলি। তার মানে এটা কিন্তু বলতে চাওয়া হচ্ছে না, যে, অর্থনৈতিক শোষণ নেই, বা তাকে অ্যাড্রেস করা যাবে না।

শোষক–শোষিত স্তরবিভাজনের চেয়ে অনেক বেশি ব্যবহার হয় ধনী–দরিদ্র স্তরবিভাজন, যা–ও অর্থনৈতিক। আমাদের মনে হয়, দারিদ্র্য কাটিয়ে ওঠার জিনিস, দারিদ্র্য একইসাথে অনুন্নয়নের উপাদান এবং অক্ষমতা। দরিদ্র — এই স্তরবিভাজনের ওপর দাঁড়ালে পরিস্থিতির বদল ঘটানোর সক্ষমতা কমে যায়। কীভাবে দারিদ্র্য এবং শোষণ–কে সামাজিকভাবে আঘাত করা যায়, তার একটি পদ্ধতি হল সমতার ইস্তাহার।

**প্রশ্ন ৩: উন্নয়নের সূচকগুলির ভিত্তি কী? এগুলো কি খেয়ালখুশিমতো নির্বাচন করা?**

উত্তর : এই ইস্তাহারে উন্নয়নের সূচক বলতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকরি, ব্যবসা, বিত্ত, ক্রয়ক্ষমতা, রাজনৈতিক ক্ষমতা, যোগাযোগের ক্ষমতা, সুপরিবেশ, অবকাশ, ভ্রমণ ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে।

শিক্ষা দীর্ঘদিন ধরেই উন্নয়নের সূচক। রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবোন্নয়ন সূচকের তিনটি উপাদানের একটি হল শিক্ষা, এবং আগে তা সাক্ষরতা এবং স্কুল শিক্ষা থাকলেও, এখন তা দাঁড়িয়েছে কলেজ শিক্ষা (মাস্টার

ডিগ্রি অবদি শিক্ষাকে সূচকের সর্বোচ্চ মান ধরা হচ্ছে মানবোন্নয়ন সূচকে)।

স্বাস্থ্যও দীর্ঘদিন ধরেই উন্নয়নের সূচক। রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবোন্নয়ন সূচকের তিনটি উপাদানের একটি হল স্বাস্থ্য, যা মাপা হয় জন্মপিছু আয়ুর নিরিখে এবং সেই সূচকের সর্বনিম্ন মান হল কুড়ি বছর ও সর্বোচ্চ মান হল পঁচাশি বছর। জন্মপিছু আয়ু একটি মোটমাট সূচক। আয়ু বাড়ে সাধারণ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা ভালো থাকলে। সাধারণ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা ভালো থাকার স্বীকৃত সূচকগুলি হল — শিশুমৃত্যু হার, জননীমৃত্যু হার, পুষ্টি, হাসপাতালের সুযোগ, এবং নানা ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব ইত্যাদি। এগুলি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার স্বীকৃত সূচক।

চাকরি হল নিশ্চিত পর্যায়ক্রমিক রোজগার এবং সমাজের অর্থনীতিতে নিশ্চিতভাবে ভূমিকা রাখার একটি স্বীকৃত বন্দোবস্ত। দেখা যায়, প্রতিটি দেশেই চাকরি করার প্রবণতা বাড়ছে। চাকরিতে অংশগ্রহণ তাই একটি উন্নয়নের সূচক। এই সূচকেরও কিছু উপাদানমূলক সূচক আছে। যেমন, সরকারি চাকরি। চাকরিতে উন্নতি। ইত্যাদি।

ব্যবসা একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সূচক। ব্যবসা একই সাথে লগ্নির সূচকও বটে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যবসায় ভূমিকা কতটা, তা সামাজিক উন্নয়নের পরিচয়।

বিত্ত একটি অর্থনৈতিক সূচক, যার মধ্যে দুটি ভাগ আছে — প্রথমটি হল আয় (এবং ব্যয় ও তার অনুপাত) এবং দ্বিতীয়টি হল সম্পত্তির পরিমাণ। উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সূচক এটি।

ক্রয়ক্ষমতা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সূচক, যা তার উপার্জনের কতটা নিজের ইচ্ছেমতো খরচ করতে পারে, তার সক্ষমতাকে দেখায়।

রাজনৈতিক ক্ষমতা হল সামাজিক উন্নয়নের সূচক। নানা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তার অংশীদারি কতটা এবং কোন পর্যায়ে।

যোগাযোগের ক্ষমতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উন্নয়নের সূচক, যা কেবল অর্থনৈতিকই নয়, স্বাধীনতার সঙ্গেও যুক্ত।

সুপরিবেশ হল আরেকটি সূচক। এটি চলতি সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, পরিবেশের অবনতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

অবকাশ ও ভ্রমণ আরো দুটি সূচক, যেগুলি সম্পূর্ণভাবে সাংস্কৃতিক। সামাজিক ও অর্থনৈতিক মানদণ্ডে এগুলিকে মেলানো শক্ত। কিন্তু মানবোন্নয়নে এই দুটির ভূমিকা অপরিসীম।

এইরকম আরো কিছু উন্নয়ন সূচক যুক্ত করা যেতে পারে।

**প্রশ্ন ৪: বিত্তশালীদের থেকে টাকা নিয়ে গরীবদের মধ্যে বিলি করার সঙ্গে মানবোন্নয়নভিত্তিক সমতার সম্পর্ক কী?**

উত্তর : অসমতার সঙ্গে বিত্তের অসমান বন্টনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বিত্তের অসমান বন্টন যে বেড়েই চলেছে আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি জুড়ে, তা দেখান থমাস পিকেটি, ২০১৩ সালে। তিনি দেখান, লগ্নির রিটার্নের হার কোনো একটি দেশের বৃদ্ধির হারের তুলনায় বেশি দীর্ঘদিন ধরে থাকলে তা বিত্তের অসমান বন্টনের বৃদ্ধির জন্ম দেয়। অর্থাৎ ধনী ধনীতর হতে থাকে এবং গরীব গরীবতর হতে থাকে। আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপের উন্নত দেশগুলিতে ১৯৮০ সালের পর থেকে যে ঘটনা ঘটে চলেছে। সর্বশেষ (অক্সফ্যাম) সমীক্ষা রিপোর্ট অনুসারে, ভারতের ১ শতাংশ ধনীতম ব্যক্তির হাতে যা সম্পদ আছে তা দেশের মোট সম্পদের ৭৩ শতাংশ। এবং ২০১৬–২০১৭ এই আর্থিক বছরে ভারতে যে পরিমাণ সম্পদ তৈরি হয়েছে, তার ৮২ শতাংশ গেছে ধনীতম ১ শতাংশের হাতে।

ধনীর আরো ধনবান হওয়া এবং গরীবের গরীবতর হওয়া পুঁজিবাদের সঙ্গে জড়িত। পুঁজিবাদ আত্মধ্বংসের পথে না গেলে এটা হতেই থাকে। তখন পুঁজিবাদের ওই আত্মধ্বংস, অর্থাৎ বিশালাকার যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। বিত্তের অসমান বন্টনের উল্টোরথ একমাত্র দেখা গেছিল বিশ্বযুদ্ধের ইউরোপে। থমাস পিকেটি সহ আরো অনেকে যে সমাধানটি দিয়েছেন, সেটি হল — অতিধনীদের ওপর কর, মোট সম্পত্তির ওপর কর। এমনিতে ভোগের ওপর কর ছাড়াও দুই ধরনের করব্যবস্থা আছে। এক, আয়কর। দুই, বংশানুক্রমে পাওয়া সম্পত্তি–র ওপর কর। আমাদের দেশে আয়কর থাকলেও বংশানুক্রমে পাওয়া সম্পত্তির ওপর কর নেই। এই দুটি কর ছাড়াও আমেরিকা এবং ইউরোপে আরো একটি কর বসানোর পক্ষে আওয়াজ জোরালো হচ্ছে — সম্পত্তি কর। আমাদের দেশে স্থাবর সম্পত্তির ওপর সামান্য কিছু কর আছে, কিন্তু তা মূলতঃ বৃদ্ধিশীল নয়, অর্থাৎ সম্পত্তি বেশি হলে করের হারও বাড়বে, এমনকি ততোধিক হার–এ, এমন নয়।

এবং তা সম্পত্তি কর ঠিক নয়, বাড়ি–কর, গাড়ি–কর, জমি–কর — এইরকম। আয়কর আমাদের দেশে বৃদ্ধিশীল, কিন্তু সর্বোচ্চ আয়কর আয়ের মাত্র ৩৫–৩৬ শতাংশের মতো।

কিন্তু এই করগুলি ছাড়া অতিধনী ১ শতাংশ এবং ধনীতম ১০ শতাংশের ওপর কর বসানোর পক্ষে সওয়াল করেন পিকেটি সহ অন্যান্যরা। ইতিমধ্যে এই ধরনের কর আছে ইউরোপের কিছু দেশে। ঘটনা হল, এই ধরনের সম্পত্তি কর ১৯৯০ সালে উন্নত তথা ধনী দেশগুলির মধ্যে ১২টিতে ছিল, কিন্তু পরে উঠে যায় বেশিরভাগ দেশে। স্পেন, সুইজারল্যান্ড, ইতালি ইত্যাদি দেশে এই কর আছে। সম্প্রতি আমেরিকা ও ফ্রান্সে দাবি উঠেছে ধনীতম ১ শতাংশের মোট সম্পত্তির ওপর ২–৩ শতাংশ হারে বার্ষিক কর বসানোর, এবং সেই কর জমি সম্পত্তি বা বসতবাড়ি সম্পত্তি থেকে শুরু করে বাণিজ্যিক সম্পত্তি — সবকিছু হিসেবে ধরে এবং সবকিছুর ওপর আলাদা আলাদা কর দেবার পরও অতিরিক্ত হিসেবে এই কর। আরেকটি দাবিও উঠেছে, সম্পত্তি করের পাশাপাশি আয়করের বৃদ্ধিশীল করের সর্বোচ্চ হারও বাড়িয়ে ৭০ শতাংশ বা তারও বেশি করা, যাদের অতি উচ্চ আয় তাদের জন্য।

সম্পত্তি কর–এর ওপর পিকেটির হিসেবটা এরকম, ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ‘ল্য মন্দ’ পত্রিকায় প্রকাশিত তার ব্লগে তিনি বলেছিলেন, ব্যক্তির মোট সম্পত্তি (ব্যক্তিগত ব্যবহার + বাণিজ্যিক) একটা চৌকাঠ পেরোনোর পরই বৃদ্ধিশীল হারে তার ওপর অতিরিক্ত বার্ষিক কর বসানো হোক। এই কর ২ শতাংশ থেকে শুরু করে ৫ শতাংশ, ১০ শতাংশ, এমনকি তারও বেশি হতে পারে। তার হিসেবটা এরকম — এতে ওই চৌকাঠের অতিরিক্ত সম্পত্তি একটি নির্দিষ্ট বছরের (ধরা যাক ৩০ বছর) মধ্যে রাষ্ট্রের কাছে (এবং তার মাধ্যমে জনগণের কাছে) ফেরত আসবে।

**প্রশ্ন ৫: কিন্তু ধনীদের কাছ থেকে টাকা নিলে তার কি অর্থনীতিতে কুপ্রভাব পড়বে না?**

উত্তর : এই আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথমতঃ পুঁজির বহির্গমন। কিন্তু স্থাবর সম্পত্তির ভিত্তিতে এই সম্পত্তি কর বসালে তা উড়িয়ে দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া মুশকিল। দ্বিতীয় আশঙ্কা — অতিধনী কমে যাওয়া মানে পুঁজির সঞ্চয়ন কমে যাওয়া, এতে বড় কোনো পুঁজিনিবিড়

শিল্প গড়তে অসুবিধা হবে। এর উত্তরে বলা যায়, এখন শিল্প বলতে বেশিরভাগই কর্পোরেট ধাঁচের এবং ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে লগ্নি–ঋণ তার মূল পুঁজি। একটি চৌকাঠের নিচে ব্যক্তি পুঁজি তো থাকছে, যা কর্পোরেট মালিকানায় শিল্প গড়ার ক্ষেত্রে কাজ করবে। বরং লগ্নি–বাজারকে বিস্তৃত করবে। তা ছাড়া, এটাও ভেবে দেখার মতো — বড়ো ও ভারী পুঁজিনিবিড় শিল্প তো রাষ্ট্রায়ত্ত্ব হওয়া উচিত। তাতেই তো দেশের মঙ্গল। কেন তা ব্যক্তি পুঁজিপতির নিয়ন্ত্রণে থাকবে? কর্পোরেট মালিকানার শিল্পতেও, বড়ো প্রোমোটার কি ভালো?

তবে এতদ সত্ত্বেও বৃহৎ পুঁজিপতি তথা লগ্নিকারী ও লগ্নি বাজারের কাছ থেকে ধাক্কা আসতে পারে। কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে তার মোকাবিলা করা দরকার। এই ধাক্কার একটি প্রকৃষ্ঠ সাম্প্রতিক উদাহরণ হল ২০১৯ সালের কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট। এই বাজেটে কর্পোরেট সংস্থায় প্রোমোটারের অংশীদারীর সর্বোচ্চ সীমা ৭৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৬৫ শতাংশ করতে বলা হয়। একইসাথে অতিধনীদের আয়কর কিছুটা বাড়ানো হয়। যেমন, ২–৫ কোটি টাকা যাদের বার্ষিক আয়, তাদের আয়করের ওপর অতিরিক্ত কর ১৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ করা হয়, এবং বার্ষিক ৫ কোটি টাকার বেশি যাদের আয়, তাদের আয়করের ওপর অতিরিক্ত কর ১৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩৭ শতাংশ করা হয়। এতে তাদের আয়কর ৩৫ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৯ শতাংশ এবং ৪২.৭৪ শতাংশ। এতে শেয়ার বাজারে, অর্থাৎ লগ্নি বাজারে ধ্বস শুরু হয়ে যায়। লগ্নি বাজার সূত্রে জানানো হয়, এর ফলে বিদেশী লগ্নিকারীরা লগ্নি তুলে নিচ্ছে। ইত্যাদি। পরে ফাইনান্স বিল সংসদে পেশ করার সময় তাতে একটি নতুন ধারা ঢুকিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয় সরকার, যার ফলে অতিধনীদের (অর্থমন্ত্রীর হিসেব মতো — হাজার পাঁচেক লোক মাত্র) এই অতিরিক্ত আয়কর অনেকটাই লঘু হয়ে যায়। সেই নতুন ধারাটি হল (দেশি বা বিদেশী) লগ্নিকারী যদি ব্যক্তি বা ট্রাস্ট হিসেবে লগ্নি করার বদলে সেটাকে কোম্পানিতে বদলে নেয়, তাহলে আর তাকে এই অতিরিক্ত আয়কর দিতে হবে না। অর্থাৎ, অতিধনীরা যদি কর্পোরেট লগ্নিসংস্থা বানিয়ে তার প্রোমোটার হয়ে যায়, তাহলে আর তাকে এই অতিরিক্ত আয়কর দিতে হবে না। অর্থাৎ অতিধনীরা যদি কর্পোরেট সংস্থার প্রোমোটার হয় তাহলে তাকে আর এই অতিরিক্ত আয়কর দিতে হবে না। আয়করের সামান্য এই বৃদ্ধির ফলে এই

পরিমাণ ধাক্কা এবং একমাসের মধ্যে প্রায় পুরোটাই পিছু হটা — তাও এমন একটি সরকারের তরফে যার একটি পার্টিরই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে সংসদে — তা দেখিয়ে দেয় — আয়করের বৃদ্ধিশীলতা অনেকটা বাড়ানো, বংশানুক্রমে প্রাপ্ত সম্পত্তির ওপর কর, বা চৌকাঠ পেরোনো সম্পত্তির অধিকারীদের ওপর অতিরিক্ত চড়া বার্ষিক সম্পত্তি কর — এতে কী হতে পারে।

**প্রশ্ন ৬: অতিধনীদের ওপর চড়া হারে কর না চাপিয়ে কর্পোরেটদের দান-ধ্যানের ওপর ব্যাপারটা ছেড়ে রাখা যায় না?**

উত্তর : ঠিক এই বক্তব্য বিল গেটস রেখেছিল থমাস পিকেটির কাছে। পিকেটি উত্তর দিয়েছিল, চড়া হারে কর এর চাপ না থাকলে বেশিরভাগ অতিধনী দান-ধ্যানটাও করবে না। বিল গেটস ব্যতিক্রম মাত্র।

**প্রশ্ন ৭: সরাসরি গরীবদের দিয়ে দিলে অপচয় হবে, ফেরত আসবে আবার সেই ধনী বা অতিধনীদের হাতে, তার চেয়ে সরকার পরিকাঠামো ইত্যাদিতে ব্যায় করলে পারে না?**

উত্তর : যদি ফেরত আসে ধনী বা অতিধনীদের হাতে, তাতেই বা ক্ষতি কী? ফের তো করের কারণে তা তাদের হাতছাড়া হবেই। আর গরীব মানুষ টাকা পেয়ে কী করে, সেটাও দেখা যাক না। কেন তাকে এত ঠুনকো বা টাকা ঠিকমতো খরচে অক্ষম বলে মনে করা? আমাদের দেশে যারা গরীব তারা বংশানুক্রমে গরীব। গরীবী তার মধ্যে একধরনের হীনমন্যতা তৈরি করে রেখেছে। বিত্ত থাকা আর না থাকার মধ্যে বস্তুগত ফারাক যেমন আছে — যথা ক্রয়ক্ষমতা ইত্যাদি নানা ধরনের সক্ষমতা, শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি উন্নয়ন সূচকে পিছিয়ে থাকা — তেমনি মানসিক একটা ফারাকও তৈরি করে। বিত্ত থাকা একটা বল-ভরসা তৈরি করে। বিশেষ করে যখন আমরা দেখছি, দেশের গরীবতম ৫০ শতাংশ লোকের (৬৭ কোটি মানুষ) সম্পদের বৃদ্ধির হার বছরে ১ শতাংশেরও কম (মাথায় রাখা দরকার, দেশের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির হার সাত শতাংশের মতো, মতান্তরে পাঁচ), এই পরিস্থিতিতে গরীবরা এমনকি নিজের সাংবিধানিক অধিকারটুকুর জন্য যে আওয়াজ তুলবে সেই সক্ষমতাটুকুও হারিয়ে ফেলছে, তার এই কোনোমতে টিঁকে থাকার জীবনধারনের জন্য। ফলতঃ সমতার আদর্শের ক্ষেত্রে ধনীদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া যতটা গুরুত্বপূর্ণ —

ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ গরীবদের মধ্যে সেই টাকাটা বিলিয়ে দেওয়া। ডিবিটি বা ডাইরেক্ট ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের মাধ্যমে।

**প্রশ্ন ৮: গরীবের সম্পদ বৃদ্ধি তো হচ্ছে? তাহলে?**

উত্তর : যদি দেশের সম্পদ বৃদ্ধির হার সাত শতাংশ হয় আর দেশের পঞ্চাশ শতাংশ গরীব মানুষের সম্পদ বৃদ্ধির হার এক শতাংশ হয়, তাহলে গরীব আরো গরীব হল। সমতার আদর্শ সম্পদ বৃদ্ধি-কে পরমভাবে দেখে না, আপেক্ষিকভাবে দেখে। কেন? কারণ, 'সম্পদ বৃদ্ধি' কোনো অনন্ত এবং ইচ্ছে হলেই যত খুশি বাড়ানো যায়, তেমন প্রক্রিয়া নয়। নতুন সম্পদ তৈরিতে মূল যে তিনটি জিনিস লাগে, তা হল থেকে যাওয়া পুরনো সম্পদ, শ্রম এবং প্রাকৃতিক সম্পদ। তিনটির ভাঁড়ারই অসীম নয়। সীমিত। নতুন সম্পদের মধ্যে লুকিয়ে থাকে এই তিনটি জিনিস।

একইসাথে, নতুন সম্পদের ভাগ কত পেল, অর্থাৎ তার সম্পদের বৃদ্ধির হার কত, তার ওপর নির্ভর করে থাকে মনুষ্য সমাজে ক্ষমতা। এই ক্ষমতাও আপেক্ষিক। ক্ষমতার আধার হিসেবে রাষ্ট্র থাকার কারণে সেখানে ধনীতরদের পাল্লা ভারী হয়। যার সম্পদের বৃদ্ধি বেশি হল, সে যার সম্পদের বৃদ্ধি কম হল, তার তুলনায় বেশি দামী উকিল দিতে পারে কোর্টে, নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলিকে বেশি ডোনেশন দিতে পারে, পুলিশ-প্রশাসনের সাংবিধানিক কর্তব্য যেহেতু সম্পত্তি রক্ষা তাই পুলিশ-প্রশাসনও ধনীতরদের পক্ষে থাকে তুলনামূলকভাবে বেশি।

**প্রশ্ন ৯: মানবোন্নয়ন সূচকে সমতাবিধানে সংরক্ষণ-কে পন্থা হিসেবে নিলে তা কি অসংরক্ষিতদের মধ্যে বিদ্বেষ তৈরি করবে না? অভিজ্ঞতা তো সেরকমই।**

উত্তর : আমাদের এখানে মূলতঃ দুই ধরনের সংরক্ষণ চালু আছে এবং আরেক ধরনের সংরক্ষণ অতি সম্প্রতি চালু হয়েছে। উচ্চশিক্ষা, চাকরি এবং জনপ্রতিনিধিত্বতে তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতি সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ। এই সংরক্ষণের মধ্যে তপশীলি জাতিগুলির সংরক্ষণের যুক্তি ছিল, হিন্দু ধর্মের চিরাচরিত জাত প্রথার কারণে ও অস্পৃশ্যতার কারণে এই সম্প্রদায়গুলি ঐতিহাসিকভাবে বঞ্চিত হয়েছে সমস্ত রকম শিক্ষা দীক্ষা সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি থেকে।এদের

কম পারঙ্গমতার জন্য এটা দায়ী। তাই এদের অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন। সেটাই জাত-প্রথার ভিকটিমদের জন্য ন্যায়বিচার – এটা তপশীলি জাতি সংরক্ষণ। আদিবাসীরা আধুনিক জীবনযাপনের ধারা থেকে বিযুক্ত। তাদের জন্য সংরক্ষণ তাদেরকে দেশের মানুষের জীবনযাপনের মূল স্রোতে তাদের সামিল করতে চেয়ে — তপশীলি উপজাতিদের মধ্যে এরা আসে। এই দুই সংরক্ষণ ছাড়াও কয়েক দশক আগে শুরু হয়েছে অন্যান্য পশ্চাদপদ বর্গ-র জন্য সংরক্ষণ। এই ওবিসি সংরক্ষণ কিন্তু ওবিসিদের মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে যারা এগিয়ে নয়, তাদের জন্য। এবং এই ওবিসি সংরক্ষণ কিন্তু ওবিসি জনসংখ্যার তুল্য শতাংশ পরিমাণ নয় (তপশীলি জাতি এবং উপজাতির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ কিন্তু জনসংখ্যার তুল্য শতাংশ পরিমাণ, প্রায়), অর্ধেকের একটু বেশি। এই ওবিসি সংরক্ষণের যুক্তি ছিল, অস্পৃশ্যতাজনিত কারণে না হলেও, সাধারণভাবে জাতব্যবস্থা ও বর্ণাশ্রম প্রথার কারণে বংশগত শ্রমবিভাজন তথা বংশানুক্রমিক পেশা চালু আছে। ফলে কিছু জাত বা সামাজিক বর্গ বা সম্প্রদায় ঐতিহাসিক কারণেই অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে আধুনিক শিক্ষা, চাকুরি ব্যবসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে। ফলতঃ তাদেরও অতিরিক্ত সুযোগ দেওয়া দরকার। এছাড়া আছে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ (জনপ্রতিনিধিত্বতে শুধু) অথবা অতিরিক্ত সুযোগ (বয়স ইত্যাদি)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ১৯৫৫ সালে প্রথম ওবিসি কমিশন তথা কাকা কালেলকার কমিশনের রিপোর্ট মেয়েদের সব্বাইকে অন্যান্য পশ্চাদপদ বর্গ বলে উল্লেখ করেছিল (এই রিপোর্ট সরকার গ্রহণ করেনি)। বছর দশেক আগে থেকে মুসলিম ধর্মের কিছু সম্প্রদায়ও ওবিসি সংরক্ষণের আওতায় এসেছে, আরও বেশ কিছু জাত-ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ওবিসি-তে — যদিও ওবিসি সংরক্ষণের মোট পরিমাণ পরিবর্তন হয়নি, অর্থাৎ, বাড়েনি। ওবিসি সংরক্ষণের আওতায় আসা মানুষদের মধ্যে থেকে জনসংখ্যার তুল্যর তুলনায় অর্ধেক সংরক্ষণ খুবই অপ্রতুল — এই অভিযোগ প্রায়শই শোনা যায়।

সাম্প্রতিক অতীতে অসংরক্ষিত অগ্রবর্তী জাত-গুলির মধ্যে যারা অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নয়, তাদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করা হয়েছে ইডবলুএস সংরক্ষণ নাম দিয়ে। প্রসঙ্গতঃ এই ইডবলুএস কিন্তু জাত-ভিত্তিক নয়, সোজাসুজি কিছু অর্থনৈতিক মানদণ্ডের ওপর তৈরি।

আমরা যে সংরক্ষণের কথা বলছি, তা এই তিন ধরনের চেয়েই

আলাদা। ইডবলুএস –এ ব্যক্তিকে কোনো সামাজিক বর্গের অন্তর্গত হিসেবে না ভেবে শুধু ব্যক্তি হিসেবে ভাবা হয়। এবং তার পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থার বিচার করা হয় (জমি, নিজ বাড়ি, বার্ষিক পারিবারিক উপার্জন ইত্যাদি)। শুধু এই পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে সংরক্ষণের ফলে সম্প্রদায়গত সামাজিক গতিশীলতার ফ্যাক্টরটিকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করা হয় এবং এতে সংরক্ষণের সুবিধা পায় তারাই, যারা ওই সামাজিক গতিশীলতায় এগিয়ে। উদাহরণ স্বরূপ, অগ্রবর্তী জাতগুলির মধ্যে ব্রাহ্মণ, বদ্যি, কায়স্থ, বানিয়া–দের সঙ্গে কি পারিবারিক পড়াশুনায়, উচ্চপেশার মানুষদের সঙ্গে চেনাজানা–ওঠাবসা–যোগাযোগ–আত্মীয়তায় পারবে কৃষক জাতগুলি? পারবে না। ফলতঃ উচ্চশিক্ষা, চাকরি ইত্যাদি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় (এবং জনপ্রতিনিধিত্বেও) ইডবলুএস সংরক্ষণের সুবিধা নিয়ে যাবে এই অংশটিই। কেস স্টাডি হিসেবে উচ্চশিক্ষায় নানা ধরনের প্রবেশিকা পরীক্ষায় এই বছর ইডবলুএস–এ কারা কারা পেলে, তাদের কতজন ব্রাহ্মণ, বদ্যি, কায়স্থ, বানিয়া এবং কতজন কৃষক জাতগুলির – – এবং জনসংখ্যার শতাংশের তুল্য কিনা এই পাওয়াগুলি — তা পরখ করে দেখা যেতে পারে। আমরা মনে করি, ইডবলুএস সংরক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গীগতভাবেই ভ্রান্ত, কারণ এটায় ব্যক্তিকে কেবলমাত্র তার আশু পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা দিয়ে বিচার করা হয়, অর্থাৎ, প্রায় ব্যক্তি হিসেবেই বিচার করা হয়। এটি প্রাকারান্তরে অগ্রবর্তী জাতগুলির মধ্যে অকৃষক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, বদ্যি, কায়স্থ ও বানিয়াদের মধ্যে যাদের আশু পারিবারিক অর্থনীতির হাল খুব ভালো না, তাদের সুবিধা করার জন্য করা হয়েছে। ইডবলুএস সম্পূর্ণভাবে কুলীনদের অর্থাৎ সামাজিকভাবে উচ্চকোটিতে বিচরণশীলদের সুবিধা করে দেবার একটি বন্দোবস্ত।

অপরদিকে এসসি–এসটি–ওবিসি সংরক্ষণের মধ্যে, বিশেষতঃ ওবিসি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে — কোনো সামাজিকভাবে প্রভাবশালী, তুলনায় বেশি অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল, সংখ্যায় একটু বেশি — এই ধরনের জাতগুলি এসসি, এসটি এবং ওবিসি সংরক্ষণের গোটাটা ভোগ করছে, কিন্তু বাকিরা সুযোগ পাচ্ছে না — এরকম একটা অভিযোগ আছে। ২০১৭ সালে স্থাপিত জাস্টিস রোহিনী কমিশন–এর মাধ্যমে এই অভিযোগ খতিয়ে দেখার কথা। ২০১১ সালের জাত–জনগণনার ফল যদি প্রকাশিত হত তাহলেও জানা যেত। এসসি–এসটি সংরক্ষণের

মধ্যে অর্থনৈতিক হাল–এর কোনো ঊর্ধসীমা নেই। সেটা না থাকায় এই সংরক্ষণের সুযোগ অনেক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিকভাবে যারা স্বচ্ছল — তাদের মধ্যে কুক্ষীগত হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় – – পশ্চিমবঙ্গে তপশীলি জাতি আছে ৫৯টি, যাদের মোট জনসংখ্যা ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী জনসংখ্যার ২৩.৬২ শতাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গে তপশীলি জাতি–র সংরক্ষণ ২২ শতাংশ। কিন্তু দেখা দরকার — এই সবক'টি জাতির উন্নয়ন সূচকে অবস্থান কী কী রকম। উদাহরণ স্বরূপ — এই সবক'টি জাতির উচ্চশিক্ষায় ঢোকার হার কত, গত পাঁচ বছর ধরে। যদি দেখা যায় — কারোর বেশ কম এবং কারোর বেশ বেশি, তাহলে বোঝা যাবে, ওই জাতির আলাদা করে বিশেষ সংরক্ষণ দরকার এবং যাদের বেশ বেশি – – তার সংরক্ষণের ভাগ কমানো দরকার। এইভাবে একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর, ধরা যাক পাঁচ বছর পর পর, উন্নয়নের সূচকগুলিতে অবস্থানের ভিত্তিতে এই সংরক্ষণের ভাগ কমানো এবং বাড়ানো যেতে পারে। সংরক্ষণের সাথে সাথেই বিশেষ সুবিধাগুলির ভূমিকাও খুব গুরুত্বপূর্ণ, যেমন, বয়সের ছাড়, স্কলারশিপ ইত্যাদি। এবং একইসাথে — উন্নয়নের সূচকগুলিতে অবস্থানের ভিত্তিতে শুধু জাতগত–ভাবে নয়, লিঙ্গ, ভাষা, ভৌগলিক অবস্থান, ধর্ম, অর্থনৈতিক বর্গ বা শ্রেণী — প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এই সংরক্ষণ এবং/অথবা সুবিধা চালু করা দরকার। এবং সংরক্ষণ/সুবিধা উচ্চশিক্ষা, চাকরি এবং রাজনৈতিক জনপ্রতিনিধিত্ব শুধু নয় – জনজীবন বা পাবলিক লাইফের সমস্ত ক্ষেত্রেই করা প্রয়োজন।

জনজীবন বা পাবলিক লাইফের ক্ষেত্রে ১০ ভাগ যদি সরকারি হয়, তাহলে দেখা যাবে ৯০ ভাগ অসরকারি। যেকোনো ধরনের অসরকারি উদ্যোগে, তা সে বাণিজ্যিক হোক বা সামাজিক, সেখানে এই সমতার আদর্শ মেনে, যারা আসছে না বা যারা আসে না — তাদের অন্তর্ভুক্তির জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আশু প্রয়োজন।

**প্রশ্ন ১০: মানবোন্নয়ন সূচকে সমতাবিধানে সংরক্ষণ–কে পন্থা হিসেবে নিলে তা কি উচ্চশিক্ষা বা চাকরিতে মেধার গুরুত্বের সঙ্গে আপস করা হলো না?**

উত্তর : উচ্চশিক্ষা মানে মানবসম্পদ তৈরি, আর চাকরি মানে হল, ব্যক্তিটি দেশের সম্পদ–বৃদ্ধিতে অংশ নিচ্ছে কি না। দেশের

উন্নয়নে অংশ নিচ্ছে কি না। উচ্চশিক্ষায় কম অংশগ্রহণ এবং বেকারত্ব রাষ্ট্রের বা সরকারের লজ্জা বা অক্ষমতা। যে ঢুকতে পারল না তার বা বেকারের লজ্জা বা অক্ষমতা নয়। ‘যোগ্যতর লোকের চাকরি’ এটা একটা ভুল ভাবনা। এই ভুল ভাবনাটা আমাদের মতো দেশে যেখানে বেকারের সংখ্যা অনেক, বেকারত্বের হার–ও বেশি এবং নানা ধরনের চাকরির মধ্যে বেতন বৈষম্য ও নিশ্চয়তার বৈষম্য খুব বেশি – সেখানে চলে। উদাহরণ স্বরূপ, ধরা যাক – স্কুলে শিক্ষকের চাকরি। যত শিক্ষক আছে – তাদের নিজেদের মধ্যেই তো ‘যোগ্যতা’ র ভালো ফারাক আছে। এবার আমি তলার লাইনটা কোথা দিয়ে টানব? দেখা যায়, চাকরির ক্ষেত্রে একটা কোয়ালিফিকেশন লেখা থাকে – এসেনশিয়াল। এর থেকে বড় আর কোনো যোগ্যতার মাপকাঠি (পরীক্ষা বা অন্য নানা কিছু) আসলে উপরিউক্ত ‘অভাবের কারণে’ বানানো। ‘যোগ্যতর’ বলে কিছু হয় না কোনো কাজে বা কোনো উচ্চশিক্ষায়। ‘যোগ্য’ হয়। বরং চাকরিতে সংরক্ষণের ফলে সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত হয় (সরকারি চাকরিতে প্রমোশনের ক্ষেত্রে সংরক্ষণের পক্ষে একটি বিচারের সময় ‘মেধা’ সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল (জাস্টিস চন্দ্রচূর এবং ইউ ইউ ললিত, মে ২০১৯), “... a “meritorious” candidate is not merely one who is “talented” or “successful” but also one whose appointment fulfils the constitutional goals of uplifting members of the SCs and STs and ensuring a diverse and representative administration” (অনুবাদ — “... একজন ‘মেধাবী’ প্রার্থী মানে কেবল সে ‘প্রতিভাবান’ বা ‘সফল’, তা নয় বরং একইসাথে যার নিয়োগের মাধ্যমে এসসি, এসটি জাতিগুলির উন্নয়নের যে সাংবিধানিক লক্ষ্য তা পূরণ হবে এবং একটি বৈচিত্রপূর্ণ ও প্রতিনিধিত্বমূলক প্রশাসন নিশ্চিত হবে।’’) উন্নয়ন মানে, একটা চিরাচরিত ‘স্যালারিড’ ক্লাসের বদলে সমাজের সর্বস্তরে ‘স্যালারিড’ ক্লাসের বিকাশ ঘটা। চুনী কোটালের ঘটনা তো বেশিদিন আগের কথা তো নয়। কীভাবে সমাজের সর্বস্তরে সরকারি ও নিশ্চয়তাসম্পন্ন বেসরকারি চাকুরির প্রসারে বাধা দেওয়া হয় – এটা তার একটা বড় উদাহরণ। এখন পরিস্থিতি কিছুটা বদলেছে – কিন্তু এখনও বেশ খারাপ। এখনও নিশ্চয়তাসম্পন্ন এবং উচ্চ বেতনের চাকরির ক্ষেত্রে ‘অপর’কে জায়গা দিতে বা সমানভাবে নিতে বাধা আছে বিস্তর। সংরক্ষণবিরোধিতা এবং মেধা বা যোগ্যতার

ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব এই বাধা–কে সংহত করে।

**প্রশ্ন ১১ : কেন সমতার ইস্তাহারের ওপর দাঁড়িয়ে কোনো সংগঠন করা হবে না?**

উত্তর : কারণ সমতার ইস্তাহারে যে সমতার কথা বলা আছে, তার কোনো ধারক সামাজিক বর্গ নেই। ফলতঃ এই ইস্তাহার যদি কোনো সংগঠন তৈরি করে তবে তা হবে নিশ্চিতভাবে একটা মতাদর্শধারীদের সংগঠন। মতাদর্শধারীদের সংগঠনের কোনো সামাজিক ভিত্তি থাকে না, বা বলা ভালো, কোনো সামাজিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে না, বরং সে সমাজের ওপর ওপর থেকে হস্তক্ষেপ করে। অপরদিকে সামাজিক ভিত্তিওয়ালা যে কোনো সংগঠন — নারী সংগঠন, মুসলিম সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, মাহাতো সংগঠন, সাঁওতাল সংগঠন, কামতাপুরী সংগঠন, সাইকেল সংগঠন, বাঙালী সংগঠন, ছাত্র সংগঠন — সে যে যা–ই হোক না কেন, সে সমাজের মধ্যে থেকে সমাজের ওপর হস্তক্ষেপ করে, ওপর থেকে নয়। মতাদর্শধারীদের সংগঠন তাই রাষ্ট্রের মতো।

সমতার ইস্তাহার নিঃসন্দেহে একটা আদর্শের কথা বলে। সমতার আদর্শ। অথবা আরো ভালো করে বললে, সমতার ধারনা। এই সমতার ধারনার বোঝাপড়া এবং মৌলিক প্রচারের জন্য তার নিঃসন্দেহে একটা কার্যকরী ছোট্ট সংগঠন থাকা বাঞ্ছনীয়। নানা রকম মানুষের সাথে তার কথোপকথন–ও খুবই জরুরি। কিন্তু ওইটুকুই।

**প্রশ্ন ১২ : কিন্তু এই ইস্তাহার প্রয়োগ তাহলে কী করে হবে?**

উত্তর : এই ইস্তাহারের প্রয়োগ দাঁড়িয়ে রয়েছে নানা সামাজিক আন্দোলনের, সামাজিক বর্গের আন্দোলনের ওপর। নানা সামাজিক আন্দোলন এবং সামাজিক বর্গের আন্দোলনের সঙ্গে এই ইস্তাহারের কোনো বিরোধ নেই। এই ইস্তাহার সেই সমস্ত আন্দোলনগুলিকে কিছু দৃষ্টিভঙ্গীর কথা পাশ থেকে বলে যেতে চায়। সেগুলি হল — মানবোন্নয়ন, সমতা, সহিষ্ণুতা, আপেক্ষিকতা, রাষ্ট্রের সীমা, ধনতন্ত্রের সীমা। নানা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, যা সাম্যাবস্থা (equllibrium) বজায় রাখা এবং সামঞ্জস্যবিধানের (consistency, agreement) লক্ষ্যে নেওয়া হয়, তার মধ্যে দিয়ে এই সমতার ইস্তাহারের আংশিক প্রয়োগ হয়। যেমন ধরা যাক, ন্যুনতম মজুরি বাড়ানো, বা স্থির করে দেওয়া। মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে যেহেতু বাজারে

জিনিসের দাম বাড়ে, তাই ন্যূনতম মজুরি স্থির না করলে বা কিছু বছর পর পর না বাড়ালে তা পরম দারিদ্র্যের পথ প্রশস্ত করে। এই পরম দারিদ্র্য সমাজের স্থিতিশীলতাকে নষ্ঠ করে, চুরি ডাকাতি বেড়ে যায়, সাম্যাবস্থা (equllibrium) সমস্যায় পড়ে। সমতার ইস্তাহার যেহেতু দারিদ্র্যকে আপেক্ষিক হিসেবে দেখে, তাই সে কখনোই মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে তাল রাখতে ন্যূনতম মজুরি স্থির করার কথা বলে না, বরং ন্যূনতম মজুরি স্থির করাকে সর্বোচ্চ মজুরি স্থির করার একটা মাপক হিসেবে দেখতে চায়, কারণ সে মনে করে, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মজুরির ফারাক কখনো তিন–চারগুণের বেশি হবে না। নানা সামাজিক আন্দোলন ও সামাজিক বর্গের আন্দোলন স্থিতিশীলতা এবং সাম্যাবস্থাকে সমস্যায় ফেলে, তখন রাষ্ট্রের তরফে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয় সেই স্থিতিশীলতা ও সাম্যাবস্থাকে বজায় রাখার জন্য। সমতার দৃষ্টিভঙ্গী সেই উদ্যোগগুলিকে দেখার সম্পূর্ণ আলাদা একটা দৃষ্টিভঙ্গী। সমতার দৃষ্টিভঙ্গীর কোনো তৃপ্তি বা অর্জন নেই। তাই তা প্রয়োগমূলক নয়। বরং নিরন্তর এক অসম্পূর্ণতা ও অতৃপ্তির বয়ান তৈরি করে যাওয়া, সহিষ্ণুতাকে সঙ্গী করে — এটাই তার একমাত্র প্রয়োগ।